(ছোট গল্পের গুচ্ছ)

ডাঃ কৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য।

সাহিত্য-কোণ।
৪৪/সি, বাগবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৩।

সাহিত্য-কোষ হইতে
শ্রীতরু ভট্টাচার্য্য
কর্তৃক
প্রকাশিত

মূল্য ২৲ টাকা

ক্যাক্সটন পেপার প্রেস হইতে
শ্রীজগদীশ রায় কর্তৃক
মুদ্রিত।

—ঃ কুমারী তরুর হাতে ঃ—

স্নেহের তরু,—

তুমি শিল্প-প্রিয় ও শিল্প-সুন্দর। তোমার হাতে এই রাঙা সুতোর বুনানিটি দিয়ে আমার ছেঁড়া জীবন-কাঁথা নিশ্চিন্ত করিয়া লইলাম।

—তোমার 'বা

—লেখকের অন্য বই—

১। ভ্রমরী ২॥০

পিছল-পথে প্রেমের লীলা-পরিণাম।

২। স্বামীর ঋণ ২।০

(২য় সংস্করণ) সতীত্ব আগে না নারীত্ব আগে? ইহার উত্তর

৩। মিস্ত্রীর মেয়ে ২॥০

(পাটকলের শ্রমিকের সজীব চিত্র)

৪। বন্দীর বান্ধবী ৩॥০

(গোয়েন্দা-কাহিনী)

৫। দস্যুর পশ্চাতে ঐ ১৷৵০

৬। পাঁকের কামড় ১

৭। বর্ষার জ্যোৎস্না

৮। বাঁকের মুখে

৯। সিংহাসন (নাটক) ১০। গৌরীদান (নাটক)

১১। রহস্যিকা

(কবিতা)

উপহার-পত্র

শ্রীমান/শ্রীমতী

কে

প্রীতি-স্নিগ্ধ শ্রদ্ধায় পুস্তকখানি

উপহার দিলাম।

শ্রী/শ্রীমতী

তারিখ

সূচিপত্র

তাড়কা রাক্ষসীর পতি-নির্বাচন

(১)

তাড়কা এখন বুড়ী হইয়াছে। তার গায়ের চামড়া এখন চামচিকার মত ঝল্‌ঝল্ করে। চক্ষু শকুনির ছোঁয়ের ভয়ে গর্তের মধ্যে লুকায়িত। গাল চুপ্‌সাইয়া গিয়াছে মানুষের মাথা না চিবাইয়া চিবাইয়া। কষের দাঁত আর নাই বলিলেই চলে, যদিও সম্মুখের দন্ত-কোদাল এখনও শিকার খনন করিতে সর্ব্বদাই সচেষ্ট।

ঐতিহাসিক বিস্ময়ের কথা এই যে, এই বুড়ীরও একদিন এমন অবস্থা ছিল যেটাকে যৌবন বলিয়া পূর্ণ সংজ্ঞা দেওয়া যায়। তখন তাহার গায়ের মাংস হাড়ের উপর আঁকড়াইয়া ধরিয়া শরীরটাকে নিটোল করিয়া রাখিয়াছিল, চক্ষু ছুটিও ছিল আকর্ণ-বিশ্রান্ত (কাণের সঙ্গে নানাবিধ গোপন ষড়যন্ত্র করিতে), কটাক্ষ ছিল অভ্রভেদী, হাসি ছিল মর্ম্মভেদী, আর আলাপ ছিল প্রেমিকের দন্তভেদী!

যৌবনের যাহা প্রধান ধর্ম্ম, তাহা তাহারও বর্ত্তমান ছিল। রাত্রে যখন সে বৃক্ষ-কোটরে অঙ্গ হেলাইয়া শয়ন করিয়া থাকিত, তখন নানা সোণালি স্বপ্নে তাহারও মন ঝক্‌ঝক্ করিয়া উঠিত। পুরুষ-সাহচর্য্যের জন্য তাহারও চিত্ত নৃত্য করিত।

কিন্তু বাপ-মা বিয়ের নাম করে না, কাজেই সে ইদানীং বড় খিট-খিটে হইয়া উঠিয়াছে। মা বজ্রকোটিনী, বজ্র-ধাতুতে গঠিত হইলেও, মেয়ের ঝাঁজ সহ্য করিতে পারে না।

একদিন মিসেস্ বজ্রকোটিনী কন্যাকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিলেন: হাঁরে তাড়ি, (তাড়কার ডাক নাম) তুই আজ-কাল এত খ্যাঁক-খেঁকে হয়েছিস কেন বল্ দেখি?

মেয়ে প্রতিবাদ করিয়া বলিল: খ্যাঁক্-খেঁকে আবার কিসের? বুড়ো বয়েস পর্য্যন্ত আইবুড়ো রেখে দিলে কোন মেয়ের মেজাজ ঠিক থাকে?

মা তখন ব্যাপারটা বুঝিয়া বলিলেন: বটে? তা যা-না, যাকে তোর পছন্দ হয়, তাকে রাক্ষস-মতে বিয়ে করনা।

মায়ের কথায় মেয়ের একটু রাগ পড়িল। সে বলিল: তোমাদের আবার কি মতে বিয়ে হয়?

জননী বলিলেন: মানুষদের যেমন ঘটকেরা বিয়ের সম্বন্ধ করে, আমাদের তেমন নয়। আমাদের নিয়ম হচ্ছে, যাকে বিয়ে করতে ইচ্ছে হবে, তাকে কোন নোটিশ না দিয়ে আমরা হঠাৎ ঘাড়ে পড়ে আঁচড়াবো, কামড়াবো, গা ছিঁড়ে দেবো। তারপর মুখে করে বয়ে নিয়ে এসে, জোর করে এক সঙ্গে ঘর করবো।

মেয়ে মায়ের মুখে বিবাহ-পদ্ধতির সবিস্তার বর্ণনা শুনিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইল। বলিল: বটে? তা এতদিন আমায় বল্লোনি কেন? আমার এতদিন বাজে গেল!

আর দেরি সহিল না। কুমারী তাড়কা তখনই বাহির হইয়া পড়িল রাক্ষস-মতে পতি সংগ্রহ করিবার জন্য।

ওদের বাড়ী ছিল গহন বনে। সেখানে কয়জনইবা লোক বাস করে? খুঁজিতে খুঁজিতে একস্থানে গিয়া দেখিল, এক ঋষি বসিয়া কাহার সহিত কথা কহিতেছেন।

একটু লক্ষ্য করিয়াই চিনিতে পারিল, তিনি ঋষি বিশ্বামিত্র!

আকৃতি খুব দীর্ঘ, ছিপ-ছিপে, যৌবনের তেজে পরিপূর্ণ। কিন্তু মুখখানি বড় গোলমেলে,—অর্থাৎ গুম্ফ শ্মশ্রুতে জঙ্গল-ময়। তা হোক! গোঁপ-দাড়িই তো পুরুষের লক্ষণ। অতএব তাহাতে ভগ্নোদ্যম না হইয়া তাড়কা তাহাকে রাক্ষস-মতে বিবাহ করিতে দন্তঘর্ষণ করিতে লাগিল।

কিন্তু সম্মুখে একজন সুন্দরী রমণী বসিয়া কি কথাবার্ত্তা কহিতেছে, সে যদি বাধা দেয়? কাজেই তাড়কা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

নারী? তবে কি বিশ্বামিত্র বিবাহিত?

সন্দেহ জাগিতেই, তাড়কা তাহা নিবারণ করিতে তৎক্ষণাৎ মশক-মূর্ত্তি ধারণ করিল ও বিশ্বামিত্রের সন্নিকটে আসিয়া তাঁহার অঙ্গের উপর বসিল। এখানে বলা আবশ্যক যে, রাক্ষস রাক্ষসীরা প্রয়োজনানুসারে যে কোনও মূর্ত্তি *ধারণ করিতে পারে।*

তারপর সে বিশ্বামিত্র ও তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্টা রমণীটির

মধ্যে যে সকল বাক্যালাপ হইতেছিল, তাহা অলক্ষিতভাবে শুনিতে লাগিল।

বিশ্বামিত্র বলিতেছেন, দেখো উর্ব্বশী! তুমি জুলুম কোরো না। আমার আজকাল কোন উপার্জ্জন নেই। আমি কি ক'রে তোমার খোরাক-পোষাক যোগাবো?

উর্ব্বশী মহা খাপ্পা হইলেন। সুন্দর পদ্মপলাশ-তুল্য লোচন দুইটিকে রক্ত-জবায় পরিণত করিয়া বলিলেন: 'কি, বিট্‌লে বামুন? দরকারের সময় যে বড়ো খোষামোদ করেছিলে? আর আজ বুঝি সমাধির কাছাকাছি এসেছো, তাই মেয়ে মানুষের ওপর অনাস্থা! ওসব কথা আমি শুনতে চাইনা! একদিন যখন আমায় নিয়ে ঘর করেছো, তখন আমি তোমার পরিবার-হইছি। যদি ত্যাগ করো, আমার খোর-পোষ দিতেই হবে। নইলে আইনের বলে, আমি তা আদায় কর্ব্বোই কর্ব্বো।

বিশ্বামিত্র শান্তভাবে বলিলেন: আমি সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী। আমার ওপর আইন খাটবে কি ক'রে?

উর্ব্বশী ঠাকরুণ মুন্সিয়ানার সুরে উত্তর করিলে: আইন সন্ন্যাসী গৃহস্থ মানে না, গরীব বড়মানুষ মানে না, বুড়ো-যুবা বয়সের ধার ধারে না।...... বেশ, যদি খোরাক-পোষাক না দাও, তাহ'লে আবার আমায় নিয়ে ঘর করতে থাকো!

বিশ্বামিত্র এবার চঞ্চল হইলেন! তাড়াতাড়ি বলিলেন: যে পাপীয়সি তার গর্ভজাত কন্যাকে প্রসব-মাত্রে বনের

মধ্যে হিংস্র পশু পক্ষীর মুখে ফেলে যেতে পারে, তাকে নিয়ে আবার ঘর কর্ব্বো?

—তবে আমার খরচ-পত্রের ব্যবস্থা করো!

—পাপীয়সি? তোর ভাবনা কি? দেবতাদের আড্ডায় মুজরো গেয়ে তুই ত বেশ দু' পয়সা রোজগার করিস্!

আঁতে ঘা পড়াতে উর্ব্বশী চটিয়া উঠিলেন, নথ ঘুরাইয়া বলিলেন: সে তো আমার উপরি-রোজগার! তা ব'লে হক্কের ধন ছাড়বো কেন?

বিশ্বামিত্র এ ন্যায়-শাস্ত্রের ফাঁকিতে আরও জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন: কুচরিত্রার আবার হক্কের ধন কি? তোর তো সবটাই ঝুটো!

উর্ব্বশীর চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। তিনি রোষে, ক্ষোভে, অভিমানে, অপমানে খাড়া হইয়া উঠিলেন। যাইবার সময়ে ডান হাতের তর্জ্জনী নেড়ে নেড়ে এই কথা বলিয়া গেলেন "এক সপ্তাহের ভেতরই দেবতাদের আদালত থেকে শমন পাবে। দেখি তোমাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে উকিলদের দিয়ে অপমান করতে পারি কিনা! আমাকে অবলা পেয়ে ফাঁকি দেওয়া? নেমক-হারাম!"

উর্ব্বশী বীর রমণীর মত সগর্ব্বে পদাস্ফালন করিতে করিতে ও সাধু আর্য্য ভাষায় গালাগালি দিতে দিতে সত্যসত্যই চলিয়া গেলেন। চলিয়া গেলে তখন মশকরূপিনী তাড়কাও বিশ্বামিত্রের অঙ্গ ত্যাগ করিল। আপনার মনকে ধমক দিয়ে মনে মনে

বলিল : "যে-পুরুষ তার বিবাহিত স্ত্রীকে কুচরিত্রের দোষ দিতে পারে সে যে তাকে বিষও খাওয়াতে পারে ! নাঃ ! এমন পুরুষের কাছে যে মেয়েমানুষ থাকে সে নেহাতই বোকা ! আমার এ বুনো শেয়াল তাড়ানো পোষাবে না !

তাড়কা বিরামিত্রকে, ব্যাকরণের লিঙ্গপ্রকরণের তৃতীয় শ্রেণীস্থ (অর্থাৎ ক্লীব) বিবেচনা করিয়া সেখান হইতে ত্বরিতে চলিয়া গেল ।

(২)

কিন্তু যৌবন-বস্তুটির চিরদিনই একটা মহাদোষ, সেটা কখনও পরাজয় মানে না। তাড়কা আবার মনের মানুষ খুঁজিতে লাগিল।

খুঁজিতে খুঁজিতে আর এক বনে হঠাৎ বশিষ্ঠ ঋষিকে দেখিয়া তাহার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। তবে কি মিলিল ?

কিন্তু খবর না লইয়া এখানে পা বাড়াইলে চলিবে না ! দেখিতে হইবে, পাঁক কিছু আছে কিনা !

বিড়াল-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিল। কিন্তু চৌকাঠে পা দিবামাত্রই বিড়ালের প্লীহা চমকাইয়া উঠিল। গৃহের মধ্যে একশোটি কাচ্চা-বাচ্চা ! সর্ব্বনাশ ! যাহার একশোটা ছেলে,— তাহার না জানি, স্ত্রী কতগুলো ! গড়-পড়তা দশটা করিয়া ছেলে গুণিলেও হিসাবে দাঁড়ায় দশটা স্ত্রী ! উঃ ! এতগুলো সতীনের সঙ্গে সে কেমন করিয়া আঁচড়া-আঁচড়ি করিয়া ইন্দ্রিয় সুখ উপভোগ করিবে ?………

ধূলো-পায়ে বিদায় হইল তাড়কা।

(৩)

কিন্তু মদন ঠাকুর যাহার পশ্চাতে লাগিয়াছেন, তার শান্তি কোথায়?

একদা নৈমিষারণ্য নামক তপোবনে এক সৌম্য-মূর্ত্তি সরল-মন ঋষিকুমার বল্কল-পরিধানে নদীতে স্নান করিবার জন্য গমন করিতেছিলেন। তরুণী তাড়কা পুরুষ-মৃগয়ায় ঘুরিতে ঘুরিতে, হঠাৎ তাঁহাকে দেখিতে পাইল। অমনি সমস্ত অঙ্গ রঙ্গ-রসে কামরাঙ্গা ফলের মত তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল। সে মনে মনে কহিতে লাগিল,—আহাহা! এমন না হ'লে পুরুষ! ইচ্ছে কচ্ছে, ওর পদতলে দিনরাত পড়ে থাকি। ও যদি আমাকে মাড়িয়েও দিয়ে যায়, তা' হলেও মনে কর্ব্বো কতকগুলো চাঁপাফুল আমার গায়ের ওপর দিয়ে হাওয়ায় উড়ে গেল!

কিন্তু কি করিয়া সে ঋষিকুমারের কাছে মনের কথা প্রস্তাব করিবে? অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে এক পরমা সুন্দরী মানবীর বেশ ধারণ করিল। (রাক্ষসীরা যখন যা-ইচ্ছা বেশ ধারণ করিতে পারে।)

ঋষিপুত্রের নিকটে গিয়া বলিল: কুমার! আমি এক রাজ-কন্যে! হঠাৎ বিশেষ এক কারণে (এই বলিয়া সে একটু মাথা চুলকাইয়া কি বলিবে তাহা ভাবিয়া লইল, ও আঁখি-ধনুকে এক বিলোল কটাক্ষ চড়াইয়া বলিল:) —এই বনে

এসে, রাজধানীতে ফিরে যাবার পথ হারিয়ে ফেলেছি। তুমি-আপনি যদি আমাকে একটু এগিয়ে দাও।

ঋষিকুমার হারীত গুরুমশাইয়ের সম্মুখে পড়া বলিতে কখনও হৃদ-স্পন্দন অনুভব করে নাই; কিন্তু আজ নাকের সম্মুখে সহসা এক অপরূপ সুন্দরী তরুণীকে দেখিয়া বুক-ধড়্‌ফড়ানির চোটে মাথা-টলমলানি অনুভব করিল। পরে তপস্যার প্রভাবে ক্ষণেকে তাহা সংযত করিয়া বলিল: "ভদ্রে! আমি যে এখন নদী-স্নানে যাইতেছি!"

ভদ্রা উত্তর করিলেন: আপনার স্নানটাই বড়ো হ'ল, আমার মানটা কিছু নয়?

—"নিশ্চয়, নিশ্চয়!" অপ্রস্তুত হইয়া ঋষি-তনয় ভদ্রতা সামলাইয়া লইলেন।

তাহার পর সুন্দরী লজ্জায় মাখনের মত মুখখানিকে আরও কোমল করিয়া ও লালসায় প্রস্তরভেদী কটাক্ষ হানিয়া বলিল: "আমি কি আপনার অযোগ্যা কুমারী? না হয়, হাত ধরাধরি ক'রে একটু এগিয়ে দিলে!"

বলিয়া খপ্‌ করিয়া হাত ধরিয়া ফেলিল ঋষিকুমারের। তখন শ্রীমান্ হারীত আনন্দে, হর্ষে, ভয়ে (আরও কি কি মনোবৃত্তিতে, আমার জানা নাই) গল্‌গল্ করিয়া ঘামিতে আরম্ভ করিলেন ও ব্রহ্মচর্য্যের সব নিয়ম ঘুলাইয়া ফেলিয়া, তাড়কার দিকে চাহিতে চাহিতে ধপাস্ করিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িলেন।

তাড়কা তাহাই চায়। সে তখন তাহার পাশে বসিয়া যে সকল বৈদ্যুতিক প্রীতি-প্রসঙ্গ চালাইতে লাগিল, তাহা আজ-কালকার দিনের প্রেম-ইন্‌জিনিয়রদিগেরও অজ্ঞাত!

তাহার পর হইতে শ্রীমতী তাড়কা গভীর জঙ্গলের মধ্যে এক কুটীর রচনা করিয়া মাষ্টার হারীতের সহিত ঘর করিতে লাগিল।

(৪)

নব যুবকদিগের অনেক প্রকার দোষ থাকে; তাহার মধ্যে একটি দোষ, তাহারা গৃহিণীজাতীয় স্ত্রীলোককে প্রীতির চেয়ে ভীতির চক্ষেই বেশী দেখে। আমাদের নূতন নায়ক-নায়িকার মধ্যে এই গণ্ডগোল আরম্ভ হইল।

তাড়কা হাজার হউক, রাক্ষস-জাতীয়া রমণী; কাজেই সে নিজেকে মানবের চেয়ে উচ্চ-বংশীয়া বলিয়া বিবেচনা করে। এ কারণে কথায় কথায়, (বড়লোকের ছেলেদের ধাত্রীর মত), সে হারীতের উপর তম্বি-তম্বা করিতে লাগিল। ইহাতে হারীত মনে মনে একটু একটু চটিতে লাগিল।

তা' ছাড়া আরও এক দোষ ঘটিতে লাগিল তাড়কার। মদন-রাজার পুনঃ পুনঃ চিমটির আঘাতে সে উপযাচিকা হইয়া হারীতের কাছে দাম্পত্য-খাজনা চাহিয়া বসিত। এটি স্ত্রীলোকদিগের একটি মস্ত দুর্ব্বলতা। পুরুষেরা প্রায় ইহাতে বিরক্ত হইয়া, প্রীতির পেয়ালা অম্ল হইতে অম্লতর রসে ভর্ত্তি

করিতে থাকে; (কেননা, যাচা [illegible] দাতার মনে মোহ-সৃষ্টি করিতে পারে না; আর মোহ না থাকিলে প্রেম-গাছ হইতে রস উৎপন্ন হয় না)।

ক্রমশঃ ক্রমশঃ এমন একদিন আসে, যে-দিন পেয়ালা একেবারেই খালি। তাড়কা-হারীতের মধ্যে অজ্ঞাতসারে এই রস-দুর্ভিক্ষ ঘটিতে লাগিল।

স্ত্রীলোক বুঝায় যেমনি বেশী, বুঝেও তেমনি বেশী। প্রীতির এই অপ্রত্যাশিত ক্রম-শুষ্কতা সে শীঘ্রই বুঝিতে পারিল, কাজেই শঙ্কিত হইয়া পড়িল,—পাছে তাহার প্রবল তৃষ্ণা-নিবৃত্তির জল ক্রমশঃ হঠাৎ একদিন একেবারেই শুকাইয়া যায়। যজমান যেমন বলির পাঁঠার উপর ক্রুর দৃষ্টি রাখে, তাড়কাও সেইরূপ হারীতের উপর নজর রাখিতে লাগিল।

কিন্তু ছোকরাদের স্বভাব তো জলের মত; কেবল গড়াইয়া যাইতে চায়। হারীত একদিন বিরক্ত হইয়া তাড়কা-সুন্দরীকে বলিল: প্রিয়ে? আমি দিনকতক বাড়ী যাই। বাবা-মা'র জন্যে বড় মন কেমন কচ্চে!

তাড়কা হারীতের মুখের কাছে [illegible] ঘুরাইয়া বলিল: তুমি কি কচি খোকা?

হারীত ছলনার আশ্রয় লইয়া বলিল: আমি আবার দু'একদিনের মধ্যেই ফিরে আসবো। তোমায় ছেড়ে কি থাকৃতে পারি?

রমণী মুখের কথার চেয়ে চোখের কথা বেশী ধরিয়া ফেলে।

তাড়কা বেশ বুঝিতে পারিল, এ সকল স্তোক-বাক্য! সে বেশ শক্ত-ভাবে বলিল: আমি তোমায় যেতে দেবো না!

নব-যুবকদের রোষ বারুদের মত, খপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। হারীত তাড়কাকে একটা কড়া-রকমের গালাগালি দিল।

এই বস্তুটী কোন স্ত্রীলোকই কখন বরদাস্ত করিতে পারে না। তাড়কা ফিরাইয়া একটা বিকটতর উত্তর দিল।

এ সকল দান-প্রতিদানে সাধারণতঃ যাহা ঘটে, তাহাই ঘটিল। হারীত ভয়ানক রাগিয়া গিয়া সেই গৃহ ত্যাগ করিয়া দৌড় দিল। তাড়কা দেখিল, সর্ব্বনাশ! সে তখন নারী-মূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া ভীষণ রাক্ষসী-মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া খপ্ করিয়া হারীতকে ধরিয়া ফেলিল। শুধু তাহাই নহে। সে আরও এক নির্ব্বোধ প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়া বসিল।

পাছে হারীত তাহার কথঞ্চিৎ তপস্যার প্রভাবে, হাত পিছ্‌লাইয়া বা চক্ষে ধূলা দিয়া উধাও হইয়া যায়,—এই আশঙ্কায়, সে তাহাকে চিরদিন পাইবার জন্য,—একেবারে আকর্ণ-বিস্ফারিত প্রকাণ্ড মুখ-ব্যাদন করিয়া খপ্ করিয়া মুখের মধ্যে পুরিয়া ফেলিল।

যাহা ঘটিল, তাহা এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই। হারীত তাহার তপস্যার তূণীর হইতে একটা অগ্নিবাণ বাহির করিবার আগেই, সে প্রেয়সীর জঠরাগ্নির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল।

(৫)

তাড়কা ভাবিয়াছিল, তাহাকে নিজের উদরের মধ্যে রাখিয়া

দিলেই যখন-ইচ্ছা বাহির করিয়া সম্ভোগ করিতে পারিবে। তাহার বিশ্বাস ছিল, উদরটা ঠিক পেঁটরার মত! ঢাকুনি খুলিলেই ভিতরের সব জিনিষ পাওয়া যায়, আবার বন্ধ করিয়া দিলেই সুরক্ষিত থাকে।

প্রাচীনকালের রাক্ষস-রাক্ষসীদের নাকি সে ক্ষমতা ছিল। অর্থাৎ তাহারা গিলিত দ্রব্য পাকস্থলী হইতে বাহির করিয়া ইচ্ছামত রোমন্থন করিতে পারিত। তাড়কা রাক্ষসীরও এরূপ শক্তি ছিল।

কিন্তু রাত্রে যখন আকাশে সমুদিত পূর্ণচন্দ্র তাহার দিকে মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল,—যখন মলয়-বাতাস গাত্র-বসন উড়াইয়া, কামনা-রসে একবার চুবাইতে লাগিল আর একবার তুলিতে লাগিল,—যখন দেহের ইন্দ্রিয়-নিচয় যৌবনের তাগিদায়, সম্ভোগের জন্য একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল,—তখন তাড়কা বড়ই আগ্রহে, বড় আশায় উদরস্থ স্বামীকে বাহির হইয়া আসিতে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতে লাগিল। কিন্তু একি? স্বামী যেন উত্তর দেন না।

"ওগো শুন্‌চো, শুন্‌চো? একবার পেট থেকে বেরিয়ে এসো না!" তাড়কা ডাকিতে লাগিল।

কোনও উত্তর আসিল না।

—শুন্‌চো?......শুন্‌চিস্ ও হতভাগা মিন্‌ষে? আয় না বেরিয়ে!

তবু না।

তখন আদরের ডাক আরম্ভ করিল তাড়কা!

"ডিয়ার? ডিয়ার? মাইরি, তোমার জন্যে আমি যে ছটফট কচ্চি।"

আগ্রহ বাড়িয়া উঠিল। তখন কাম-পীড়িতা রক্ষঃসুতা পৃথিবীর সর্ব্বপ্রকার ভালবাসার ভাষা ব্যবহার করিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল। বলা বাহুল্য, রাক্ষস মাত্রেই সর্ব্বভাষায় সুপণ্ডিত হইয়া থাকে।

—শুনচো, শুনচো ডিয়ারি *(Dearie)*. ও ডিয়ারি *(Dearie)*?—একবার বেরিয়ে এসোনা ভাই!

ডিয়ারি হয়তো তখন অম্লরসে পরিপাক হইয়া ভার্য্যার রক্ত-কণিকাগুলির সঙ্গে মিশিতেছিল।

"হারীত? হারীত? লভি *(Lovey)*? ওগো মেরা জান? ওগো প্রিয়তম?…ও প্রাণেশ্বর?…আমি যে তোমায় ছাড়া থাকৃতে পাচ্ছি না!" কিন্তু প্রাণেশ্বরের কোন খবরই নেই! তখন নিজের পেটের উপর মুখটা রগড়াইতে রগড়াইতে কান্নার সুরে বলিতে আরম্ভ করিল, **Sweet-heart? Sweet-heart?** ক্ষমা করো!…অজ্জ উত্ত? অজ্জ উত্ত? কহিং সি? (ভাবিল, সংস্কৃত-ভাষায় বলিলে হয়তো ঋষিকুমার বুঝিতে পারিবে! সে'তো বাঙলা কি ইংরিজি কি উর্দ্দু ভাষা বুঝে না!)

কিছুতেই কিছু হইল না। হারীত কোন প্রেমরস-বিগলিত ডাকেই উদর হইতে অক্ষত শরীরে বাহির হইয়া আসিয়া তাহাকে চুম্বনদান করিল না।

তখন তাড়কা আপনার পেটের উপর অনবরত হাত চাপড়াইতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে সেখান হইতে শুধু ভুট্‌-ভুট্‌ ভড়্‌-ভড়্‌ শব্দই আসিল, আর কিছু আসিল না।

তাড়কার সন্দেহ হইল হঠাৎ তাহার শক্তির কোন ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। যাহা তাহাদের জাতিগত গুণ, তাহা কেমন করিয়া স্তম্ভিত হইতে পারে, সে বুঝিতে পারিল না।

বড়ই সন্দেহে ও বিষাদে সে গেল তাহাদের জাতির এক ভূত-ভবিষ্যৎ-জ্ঞা গণকীর নিকটে। গিয়া কহিল: ঠান্‌দিদি! এ আমার কি হ'ল? একটা মানুষ খেয়েছিলুম, আর সেটাকে পেট থেকে বার কর্ত্তে পাচ্ছি নে কেন? এমন তো আমি কত্তে পারতুম!

গণৎ-কারিণী খুব বিজ্ঞভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল: হুঁ! অ-খিদের ওপর খেয়েছিলি বুঝি? তাই পেটের মধ্যে কোথায়ও আটকে রয়েছে!

—না, খুব খিদের সময়ে খেয়েছিলুম!

খুব বুদ্ধিমতীর মত পণ্ডিতানী বলিলেন: ও! সেইজন্যে হজম হয়ে গেছে!......(আর একটু ভাবিয়া বলিলেন)...... আচ্ছা, সে মানুষটাকে তুই চিনতিস্?

—না, হাঁ,—তবে কিনা,—

—বলি, সে বামুন না ছুদ্দুর?

—বামুনের ছেলে!

—ছোঁড়া?......আচ্ছা দাঁড়া দেখি!

বলিয়া গণকী গণিতে বসিলেন।

এই উদ্দেশ্যে তিনি যাহা প্রক্রিয়া করিলেন, তাহা এইরূপ :-

এমন কতকগুলি মরা-মানুষের হাড় আনিলেন, যাহারা জীবিত অবস্থায় বিশেষ বউ-পাগলা ছিল এবং সেই বউগুলির হস্তেই শেষে পঞ্চত্ব-প্রাপ্ত হয়। দশ ভাঁড় রক্ত আনিলেন যে-রক্ত, যাহারা বিধবা হইয়াও সধবাত্ব সচল রাখিয়াছেন, সেই সকল সাহসিকা স্ত্রীলোকের। শ্বেতবর্ণ কতকগুলি গুঁড়া আনিলেন, যেগুলি বেদিয়া-রমণীগণ সাধারণতঃ ব্যবহার করিয়া থাকে পুরুষ বশ করিবার জন্য।

এই সকল উপযুক্ত উপাদানের সহযোগে রাক্ষস-গণকী অঙ্ক পাতিলেন। তাহার পর বিড়্ বিড়্ করিয়া অনেক মন্ত্র আওড়াইতে লাগিলেন।

এ সকল মন্ত্রের মধ্যে ছিল বোর্ণিয়োর নরখাদকদিগের চুষ্-চুষ্ ভাষা,—আফ্রিকার চিম্পাঞ্জীদের (Chimpanjee) দন্ত-মূলীয় শব্দবিন্যাস,—ও বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মিনীদের 'হালুম' 'হালুম্' নামক লম্ফ-সাহিত্য।

যাহা হউক, প্রায় অর্দ্ধঘন্টা-ব্যাপী গণনার পর গণকী বলিলেন: ছ্যাথ্ তাড়ি! তুই কতকগুলি পুণ্যকাজ করেছিস্, তাই তোর এমন দশা হোলো। তুই সে ছোঁড়াকে বিয়ে করেছিলি, না?

তাড়কা লজ্জিতভাবে অথচ প্রফুল্লমুখে বলিল : কেমন করে জানলে ঠান্‌দি?

—এই যে আমার গণনার অঙ্কের ওপর মন্ত্রের চোটে প্রজাপতি উড়্‌ছিল। প্রজাপতি মানেই বিয়ে!

তাড়কা বলিল: ও! তা-তা—এই বয়সে বিয়ে না ক'রে কি থাকা যায়?

গণকী বলিলেন: হুঁ। তা হ'লে তুই বড়ো বড়ো অনেক-গুলো পুণ্যকাজ করে ফেলেছিস্!......কেন কর্‌লি? জানিস্ তো আমাদের ধাতে পুণ্যকাজ করা সয় না!

কৌতূহলাক্রান্তা হইয়া তাড়কা জিজ্ঞাসা করিল: কি কি পুণ্যকাজ ঠান্‌দি?

তিনি উত্তর করিলেন: প্রথম, বিয়ে! দ্বিতীয়, স্বামীকে খাওয়ানো! তৃতীয়,—হাঁ, এ কাজটা তুই বড্ডই খারাপ করেছিস্! মানুষ-জাতের এ কাজে ভারি পয়সা-কড়ি প্রতাপ-প্রতিপত্তি হয়,—কিন্তু আমাদের এটা সয় না! শুধু আমাদের কেন,—মানুষ ছাড়া আর কোন জাতেরই এমন কাজে ইষ্ট হয় না! বরং, ভারি অনিষ্ট হয়! পশুরাও এমন কাজ কখনও করে না।

—এমন কি কাজ ঠান্‌দি?

—ওরে বাবা! আমার মুখে আনতেও আটকে যাচ্ছে! সে কাজটা হচ্ছে, "বিশ্বাসঘাতকতা"! এটা মানুষের কাছে সব পুণ্যের চেয়ে বড় পুণ্য,—কিন্তু আমাদের কাছে সব পাপের চেয়ে খারাপ পাপ!

তাড়কা গণৎকারিণীর কথা শুনিয়া বড়ই ভয় পাইল।

চির-জীবন স্বামী-খাদ্যে প্রবঞ্চিতা থাকিবার ভয়ে সশঙ্কে জিজ্ঞাসা করিল :—

—বিশ্বাসঘাতকতা কি করলুম ?......

—করলি না ? হারীত তোকে বিশ্বাস ক'রে তোর সঙ্গে ঘর করছিল,—আর তুই কিনা তাকে খেয়ে ফেললি ?··· পেটের মধ্যে পুরে ফেললি ? ছিঃ, ছিঃ ! এই পাপেই আজ তোর এই দশা !······প্রাইশ্চিত্তির কর !

—এর পেরাচিত্তির কি ঠানদিদি ?

ঠানদিদি অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া তাঁহার বৈজ্ঞানিক মাথাটা নাড়াদিয়া উত্তর দিলেন : কঠোর পেরাচিত্তির !···এ জন্ম ত্যাগ ক'রে পৃথিবীতে গিয়ে বাঙ্গালাদেশে জন্মাগে যা ! তা' হলেই জানতে পারবি, স্বামী-খাওয়ার কি প্রায়শ্চিত্তির ! সেখানকার বাল্য-বিধবারা যে কষ্ট পায়, না-খাওয়া, অখাদ্য-খাওয়া, ঝাঁটা-খাওয়া, গালি-খাওয়া,—সেইগুলোই হবে তোর পেরাচিত্তির !···তবে তোর পাপ কাটবে !

* * * * *

তাড়কা বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে।

জুতো সেলাই

সকালে ঘুম ভাঙতেই অক্ষয়ের মনে পড়লো, আজ এক সপ্তাহ ধরে তার জুতো যোড়াটার এমন অবস্থা হয়েছে যে, সে-দুটোকেই তার পা বয়ে বেড়ায়, জুতো আর পা বইতে পারে না। ক'দিন অবকাশের অভাবে এই প্রয়োজনীয় ব্যাপারটা সংশোধন করা হয়নি; আজ রবিবার, ছুটির দিন,— কাজেই এই কাজটার কথা আগে তার মনে পড়লো।

মুখ ধুয়েই হোক্, কি না ধুয়েই হোক্, রাস্তার ধারের বারান্দায় বেরিয়ে এদিক-ওদিক তাকালো কোনও মুচি যাচ্ছে কি-না দেখবার জন্যে। মনে হ'ল, একজন যেন ঝুলি-কাঁধে দূরে যাচ্ছে; সে তখন চিৎকার ক'রে ডাক্‌তে লাগলো: মুচি? মুচি?

কেউ উত্তর দিল না, ফিরেও তাকালো না।

পথযাত্রী একজন প্রতিবাসী বললেন: কচ্চেন কি মশাই? 'মুচি' ব'লে ডাকচেন? 'ব্রাশ' ব'লে ডাকুন, তবে উত্তর দেবে।

অক্ষয় প্রতিবাদ ক'রে বললো: আরে মশাই, মুচিকে মুচি ব'লে ডাকবো না'তো কি 'ভট্টচায্যি মশাই' ব'লে ডাকবো?

প্রতিবাসী বললেন: ওরা ও-অসভ্য নামে আর জবাব দেয় না, ওরা সভ্যনাম নিয়েছে 'ব্রাশ'। কেন শুধু শুধু চেঁচাবেন? ওই নামে ডাকুন দেখি।

অক্ষয় বললো : ভাল মুস্কিল ! এ আবার কবে থেকে হ'লো ?

প্রতিবাসী বললেন : সবাই জেগেছে, মশাই, সবাই জেগেছে ! কেবল আপনারাই ঘুমুচ্ছেন। ওরাও এখন আঞ্জুমান শিখেছে !

অক্ষয় প্রায় নিজ-মনেই বললে : গান্ধীজী এই সব শিখিয়েচে আর কি ! ওরাও সব ভদ্দর-লোক হয়ে গেল।

সমালোচনা ছেড়ে কাজের দিকে মন দিয়ে অক্ষয় বাবু তখন ডাকতে লাগলো : 'এ ব্রাশ ? ব্রাশ ?

নূতন উপাধি-যুক্ত জুতা-সেলাইকারী তখন পেছন ফিরে তাকালো, বললে : মোড়্‌পর জুতি লে-আইয়ে ! হুঁয়া হাম্ বৈঠ্‌তা হায়।

প্রতিবাসী তখনও সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি বললেন : ওরা আর এখন বাড়ীতে আসে না। ওরা একটা ক'রে আড্ডা খুলেছে। সেইখেনে জুতো নিয়ে যেতে হবে।......ওরা আর এখন কাজ খোঁজেনা মশাই, কাজই ওদের খোঁজে।

"বটে" ? অক্ষয় বিস্মিত। কিন্তু শুধু বিস্ময়ে জুতো-সেলাই হয় না। তাকে কাজেই যেতে হ'ল ছেঁড়া জুতো-যোড়া হাতে ক'রে পথের ওপর দিয়ে, ব্রাশের আড্ডায়।

—কেত্‌না লাগেগা ?

ব্রাশ জুতো-যোড়া চক্ষু ও হিসেব দিয়ে দেখে বললে : দো রূপেয়া !

—দু টাকা! বলিস কিরে? এইটুকু ছেঁড়া সেলাই করে দিতে এত্‌না লাগেগা?

ব্রাশ অবজ্ঞাসূচক মুখভঙ্গি ক'রে গম্ভীরভাবে বললোঃ এক পয়সা কম্‌তি নেহি বাবু!

বাবুও কম্‌তি নয়। অক্ষয় জুতো যোড়াটা নিয়ে বাড়ী ফিরে এলো। ইচ্ছা, অন্য কোনও মুচিকে চেষ্টা দেখবে।

মনি-ব্যাগটা খুলে দেখলো, তাতে আছে দু'টাকা। গায়ে একটু বল হলো।

আবার আর এক ব্রাশের চেষ্টায় বেরুবে, এমন সময় পত্নী এসে বললেনঃ কুচো-চিংড়ি খেয়ে খেয়ে তো পেটে প্রবাল-দ্বীপ গজিয়ে গেল। আজ একটু পোনা-মাছ নিয়ে এসো না!

[এস্থলে বলা আবশ্যক, পত্নী ম্যাট্রিকুলেশন অবধি পড়েছিলেন; কাজেই, প্রবাল-দ্বীপ কি ক'রে হয়, তা জানতেন।]

অক্ষয়ও ঠিক ঐ কথাটাই ক'দিন ধরে মনে তোলা-পাড়া কচ্ছিল। কিন্তু দামের গলা-টিপুনিতে ইচ্ছাটাকে বুকের মধ্যেই পুরে রেখেছিল। পোষা কুকুর যেমন কোন আগন্তুকের সাড়া পেলে শোবার যায়গা থেকে ছুটে আসে, বুকে আটকানো ইচ্ছেটাও তেমনি ভার্য্যার ইঙ্গিতে সজোরে বেরিয়ে পড়লো।

জুতো-যোড়াটা বগলে ক'রেই অক্ষয় বাজারে গেল, উদ্দেশ্য, মাছ কেনা ও জুতো সেলাই এক সঙ্গেই করে আসবে।

কিন্তু পুঁজি ঐ দুটো টাকা। প্রথমে মাছ কিনতে গিয়ে উৎসাহের মওড়ায় যা খরচ হয়ে গেল, অক্ষয় তারপর বাকি পয়সা দেখে মাথায় হাত দিয়ে বসলো। মাছটা এক হাতে দোলাতে দোলাতে যখন বাড়ী ফিরে এলো, তখন স্ত্রী খুব আনন্দ প্রকাশ করলেন বটে, কিন্তু অক্ষয় কিছুতেই সে তালে স্বাধীন হাঁসি হাঁসতে পারলে না।

খাওয়া-দাওয়া সেদিন মন্দ হ'ল না। পত্নীও সেদিন যেচে কাছে এসে মধ্যাহ্ননিদ্রার সময় পায়ে হাত বুলিয়ে দিলো। কিন্তু একটা অবিচ্ছেদ্য যন্ত্রণা অনবরতই অক্ষয়ের বুকে খচ খচ ক'রতে লাগলো। ঐ জুতা-যোড়াটা! সেটা নিষ্ঠুরভাবে ঘরের মধ্যে থেকেই কাবুলিওয়ালার মত তাকে শাসাতে লাগলো।

হ'লনা মধ্যাহ্ন-নিদ্রা! অক্ষয় উঠে পড়লো, জুতো যোড়াটার যা'হ'ক একটা ব্যবস্থা কর্ত্তে। সে-দুটোকে আবার হাতে করে একটা ছেঁড়া বহুদিনের পেনসন্-প্রাপ্ত চটি-জুতোর সকরুণ সাহায্যে অক্ষয় বেরিয়ে পড়লো জুতা-চিকিৎসকের সন্ধানে।

সকাল বেলায় যেদিকে গিয়েছিল, সেদিকে না গিয়ে অন্যমুখে সে এগিয়ে চললো। একটু দূরেই আর একজন ব্রাশ বসেছিল দশ বারো জোড়া ছেঁড়া জুতোর হাসপাতাল খুলে। সেখেনেই অক্ষয় গেল তার জুতোরও চিকিৎসা করাতে।

—কেত্‌নামে হোগা ভাই?

—কিয়া বলি বাবু? আঢাই রুপেয়া দিজিয়ে!

কেনবার সময় ত এক হপ্তা মাছ আনা বন্ধ হয়েছিল। এখন ছেঁড়া-জুতো সেলাইয়ের সময়ে, দু'দিন মাছ খাওয়া বন্ধ কর্ব্বে?

এত বড়ো যুক্তির ওপরেও ব্রাশ মহাশয় প্রসন্ন হ'ল না। সে মাত্র দু'আনা কমাতে পারে,—তাও পুরাণো বাবুকে খাতিরসে। অগত্যা বাবুকে রণে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতে হোলো।

রাগ ক'রে নাক-মুখ সিঁটকে অক্ষয় বাড়ী ফিরে এলো। আর কোন ব্রাশের কাছে দর যাচাই করে তার অভিরুচি হলো না। বাড়ীতে এসে, জুতো-যোড়াটা রেখে সটান খাটের উপর গিয়ে শুয়ে পড়লো।

কিন্তু চোখ বুজলে কি হবে, মন তো বোজেনি। মনের আর্সির ওপর অনবরত ছেঁড়া জুতোর ছবি প্রতিবিম্বিত হ'তে লাগলো।

কি মনে হলো, হঠাৎ উঠে নিদ্রিত পরিবারকে জাগিয়ে তুলে বললে: তোমার মোটা ছুঁচ-সুতোটা একবার বার ক'রে দিতে পারো?

অন্যদিন হ'লে পরিবার এই বিনীত হুকুম তামিল করতো কিনা সন্দেহ,—কিন্তু আজ পোনা মাছের দৌলতে স্বামীর গৌরব যথেষ্ট বেড়ে গেছে। তবু পতিব্রতা নারী গজ্ গজ্ করতে করতে অক্ষয়কে ছুঁচ সুতোটা বার ক'রে দিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে শুলো। আশঙ্কা, পাছে আবার নূতন কিছু হুকুম এসে পড়ে।

হঠাৎ মুকুন্দ ঘরে ঢুকে বললে : একি কচ্ছ হে ? শেষ-কালে জুতো অবধি সেলাই ? নাঃ ! চণ্ডী পাঠ থেকে জুতো-সেলাই, কিছু আর বাকি রাখলে না দেখছি।

ঘরে একটা দৈত্য ঢুকে তার ঘাড়টা মটকে দিলেও অক্ষয় বোধ হয় এতো যন্ত্রণা পেত না, যা' সে অনুভব করলো হঠাৎ তার বন্ধু মুকুন্দের ঘরের মধ্যে অপ্রত্যাশিত প্রবেশে। যে ভয়ানক পাপ ও অপরাধটা সে তখন কচ্ছিল, সেটাকে চাপা দেবার চেষ্টায় বলে উঠলো : আরে, জুতো সেলাই আবার কোথায় দেখলে ? দু'টো মাত্র ফোঁড় দিচ্ছি ছেঁড়া জুতোটায় !

—হাঁ, হাঁ, ঐটিকেই বলে মুচিগিরি ! ছিঃ ! হিন্দু ধর্ম্মটা তোমরাই উচ্ছন্ন দিলে দেখছি। ব্রাহ্মণ হ'য়ে কোথায় বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন করবে, তা নয়, শেষকালে কিনা মুচিগিরি ! অক্ষয়ের মুখ-চোখ সব লাল হয়ে উঠলো ; কিন্তু তবু (বর্ত্তমান কংগ্রেস-ধর্ম্মীর মত) প্রতিপক্ষের নিন্দনীয় নিন্দা সে গায়ে না মেখে উত্তর দিল : কি বলচো তার ঠিক নেই ! নিজের জুতোতে একটা ফোঁড় দিলেই মুচি হ'য়ে যায় ?

মুকুন্দ বোধ হয় হিন্দু শাস্ত্রে অতিমাত্র ভক্তিমান্ ব্যক্তি

ছিল। সে অক্ষয়ের উত্তরে আরও রেগে গিয়ে বললে একে তো কোরছো মুচিগিরি, তার ওপর আবার একটা এঁড়ে তক্ক তুলে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা কচ্ছ! ছিঃ! এই জন্যেই তো আমাদের এত অধঃপতন! আমাদের পরাধীনতা কিসের জন্যে? এই মেরুদণ্ড নেই বলেই তো!

এই কথা বলতে বলতে, তার নিজের মেরুদণ্ডটা বেশ সোজা করে মুকুন্দ বাবু বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। অক্ষয় খানিকটা ভ্যাবা-চাকা হ'য়ে গেল; সেই অবস্থাতেই সে তাড়াতাড়ি জুতো সেলাইটা সেরে নিলে।

জুতোর ছেঁড়া অংশটা সেলাই হ'ল বটে, কিন্তু মনে অনেকটা ছেঁড়া দেখা দিল। সেটা অক্ষয় কিছুতেই সেলাই কর্ত্তে পারলো না। সেদিন আর ঘর থেকে বেরুলো না! রাত্রেও ঘুমুতে ঘুমুতে মুকুন্দ'র গালাগালিগুলো কাণে বেজে উঠেছে।

সকাল বেলায় খেয়ে দেয়ে আফিসে যাওয়ার জন্যে ট্রাম ধরলো। ট্রামে উঠতেই তাদের আফিসের আর একজন কেরাণী সহকর্ম্মী তাকে অভ্যর্থনা করে বললে: কি হে ব্রাশ-বামুণ? জুতোটা সেলাই হ'ল কেমন?

অক্ষয় ভ্রূ-কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলে: ব্রাশ-বামুণ কি রকম?

লোকটি উত্তর করলেন: "এই শুনলুম, আজকাল জুতো সেলাইও ধরেছো! তা মন্দ নয়! উপরি রোজগার কিছু হ'তে পারে বৈ কি!" অক্ষয় বুঝতে পারলো, এ মুকুন্দের কাজ! সেই-ই এই কথাটা সকলকে বলে বেড়িয়েছে।

আফিসের মধ্যেও নিস্তার নেই! মুকুন্দ একই আফিসে কাজ করতো। সে যাবৎ সহকর্ম্মী কেরাণীকে অক্ষয়ের কালকের কীর্ত্তি সবিস্তারে বর্ণনা করলো। অক্ষয় অনেক কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা করলো। কিন্তু কে শোনে?

ক্রমশঃ ক্রমশঃ এমন হ'য়ে দাঁড়ালো যে, আফিস থেকে ট্রাম, ট্রাম থেকে পাড়া, সকলেই তাকে 'ত্রাশ-বামুন' ব'লে নাম-খাস্ত কর্ত্তে আরম্ভ করে দিল।

কিন্তু জুতো শুধু অক্ষয়ের ছেঁড়ে না, মুকুন্দ'রও ছেঁড়ে। মাস তিনেকের মধ্যেই মুকুন্দ আবিষ্কার করলো, তার জুতোও মুখের দিক্‌টায় হাঁসতে আরম্ভ করেছে।

দু'একদিনের মধ্যে জুতোর সেই মুচকি হাঁসি একেবারে আকর্ণ-বিস্তৃত হয়ে দাঁড়ালো। এমন হ'ল যে, সে-জুতো নিয়ে আর পথ চলা যায় না।

মুকুন্দ বিমর্ষ হ'লো। নতুন জুতো কিনতে গেলে একেবারে আঠারো কুড়ি টাকা। অথচ এ মাসে শ্বশুর-বাড়ীতে এক বিয়ে। তার জন্যে গোটা ত্রিশ টাকা মাইনে থেকে কেটে রাখতেই হবে। সেটা যে পারিবারিক প্রথম দেনা! না দিলে, আফিসের ভাত অবধি বন্ধ হ'তে পারে।

কিন্তু এদিকে জুতো-মশাইও হাঁ করেছেন। এখন কোন্ কুল রাখে?

দান করেছিলেন ভাল ব্রাহ্মণ ব'লে, বোশেখ মাসের দিনে।

খপ্ ক'রে সেই পৈতেটা তুলে নিয়ে মুকুন্দ সেটা চট পট ক'রে খুলে ফেললে। খানিকটা সুতো তার থেকে নিলে ছিঁড়ে।

একটা ছুতো-নাতা ক'রে পরিবারকে ঘর থেকে সরিয়ে দিলে, তারপর ঘরে দিল খিল!

পৈতে-সুতোটার ছিন্নাংশটা নিয়ে সেটা পরালো ঐ ছুঁচটায়। তারপর ছেঁড়া জুতোটা হাতে তুলে নিয়ে, চারদিক একবার ভাল ক'রে চেয়ে দেখ,—সদব্রাহ্মণ মুকুন্দচন্দ্র জুতোটা সেলাই করতে বসলো।

একবার মনে পড়লো অক্ষয়ের কথা। তখন সেটা জোর ক'রে মন থেকে সরিয়ে দিয়ে উপস্থিত কাজে মনঃসংযোগ করলো। একবার চোখ তুলে দেখে নিল, ঘরের খিলটা সে দিয়েছে কি না।

সে বিষয়ে সুনিশ্চিত হ'য়ে, মনে খানিকটা জোর পেয়ে, সে যেমনি জুতোটিতে ছ'ফোঁড় সেলাই দিয়েছে, অমনি দরজায় ঘা পড়লো: মুকুন্দ, মুকুন্দ?

যে এসেছিল, সে লোকটা এমন অভদ্র যে, তার আর দেরি সয় না। হঠাৎ মারলে দরজায় এক ধাক্কা।

কিন্তু দুর্ভাগ্য যখন আসে, তখন এই ভাবেই আসে। দরজায় খিলটা ছিল একটু আলগা, ধাক্কা মারতেই দরজাটা ঝপাং ক'রে খুলে গেল।

মুকুন্দ সভয়ে চেয়ে দেখে, অক্ষয় হাজির।

—আরে একি! জুতো সেলাই কর্চ্ছ? যেজন্য আমাকে পথে, ঘাটে আফিসে বন্ধুদের কাছে দিনরাত কর্চ্ছ অপমান, সেই কাজ কর্চ্ছ নিজে, ঘরে দরজা বন্ধ ক'রে?

—"অ্যাঁ,—অ্যাঁ—না, না,—ওটা কি জানো"—মুকুন্দ আম্‌তা আম্‌তা কর্ত্তে লাগলো।

অক্ষয় থামলো না, আবার আরম্ভ কর্লো: শুধু জুতো সেলাই নয়! আবার পৈতে সুতো দিয়ে! এই তোমার বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম! ছিঃ। মুখ দেখাতে লজ্জা কর্চ্ছে না?

মুকুন্দ সেই দিন থেকে প্রতিজ্ঞা করেছিল, আর কখনও জুতো সেলাই কর্ব্বে না। তাতে মাছ খাওয়া বন্ধ হয়, হোক্‌গে!

একপোয়া মাংস

—:(*):—

বিভঞ্জন চৌধুরী গিরগিটিপুরের একজন পাঁচ-জনের-ভেতর-একজন রোগা-মোটা ধরণের লোক ছিলেন। যাঁরা শেষোক্ত বিশেষণটি অসম্ভব ব'লে সন্দেহ করেন. তাঁদের জ্ঞাতার্থে বলতে পারি, তাঁর পেটটা ছিল মোটা আর হাত-পা-গুলো ছিল রোগা।

তিনি হঠাৎ একদিন চিন্তা কর্ত্তে কর্ত্তে আবিষ্কার করলেন, বাল্যাবধি কখনই একপোয়ার বেশী মাংস খেয়ে উঠতে পারেন না। যখনই তার-বেশী মাংস তিনি খেয়েছেন, তখনই দেখেছেন, হয় গলায় আঙুল দিয়ে দামী মাংসগুলি তুলে ফেলতে হয়েছে, না হয়, তারপর দু'দিন আর দৈনন্দিন খাদ্য খেয়ে উঠতে পারেন নি। এটা একটা রোগ,—নিশ্চয়ই একটা বড় ব্যাধি।

ভার্য্যা নীহারিকাকে জিজ্ঞাসা করলেন: হাঁগা, লোকে কতটা-ওজন মাংস একেবারে খেতে পারে?

ভার্য্যা বললেন: তা কি জানি? আমার এক ভগিনীপতি আছেন. তিনিত আমার বাপের বাড়ীতে গেলেই আধসের-তিনপো মাংস অনায়াসে খেয়ে ফেলেন।

—বটে? অতোটা মাংস খেয়ে বমিও করেনা, বা দু'তিন দিন না খেয়ে থাকে না?

—কই, তা তো কখনো দেখিনি। দুপুরবেলায় তিনপো মাংস খেয়ে, আবার ত দেখেছি রাত্তিরে দু'ডজন তিন-ডজন লুচি,—

—আর বোলোনা, বোলোনা! আমি শুনে ভির্মি যাচ্ছি! ...হুঁ! তা হ'লে এটা একটা আমার রোগ!

ভার্য্যা বললেন: তা হবে! রোগ হয়ে থাকে, ডাক্তার দেখাও!

ভার্য্যার বুদ্ধিমত্তার ওপর বিভঞ্জনবাবুর বিশেষ ভক্তি ছিল। অনেক দুরূহ সমস্যা (যা বিভঞ্জনবাবু নিবারণ কর্ত্তে অনেক সময় হাবু-ডুবু খেয়েছেন) সেগুলো নীহারিকা প্রায়ই আধ-মিনিটে ঠিক করে দিয়েছে। ও-ও যখন বলেছে, তখন নিশ্চয়ই এটা রোগ। আর রোগ হ'লেই, তার ওষুধ হচ্ছে ডাক্তার দেখানো!

পাড়ায় একজন অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার ছিলেন। তাঁর কাছে একদিন বিভঞ্জন গিয়ে উপস্থিত।

ডাক্তার রোগের সমস্ত বিবরণ শুনে, একখানি মালগাড়ীর মত লম্বা প্রেস্‌ক্রপ্‌শন করে দিলেন। তাতে সব রকম মালই বোঝাই হয়েছিল। কয়লা, লৌহ, তাম্র ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার খনিজ, অন্যান্য উদ্ভিজ্জ, এমনকি জৈবজ অনেক প্রকার ভেষজ ও সজ্জিত ছিল। মিকশ্চার দিনে তিনবার, প্রধান প্রধান খাওয়ার পর খেতে হবে। খাওয়ার আগে একটি ক'রে বড়ি। খাওয়ার মাঝে একবার ক'রে আরক। দুইটি পুরিয়াও ছিল,

যদি খাওয়ার শেষে অম্বল ঢেঁকুর উঠে,—তবে! এ ছাড়া খাদ্যের সময়-সম্বন্ধ-হীন একটি স্নায়ু-তেজস্কর ঔষধ ছিল, দিনে তিনবার ক'রে খেতে।

মালগাড়ীখানি যখন ষ্টেশনে এসে পৌঁছালো, তখন বিভঞ্জন হিসেব ক'রে দেখলেন, গস্ত করেছেন সাড়ে সাতাশ টাকার ঔষধ! বুক থেকে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়লো; কিন্তু বিভঞ্জনবাবু একটা সান্ত্বনা খুঁজে বার করলেন। যাক্‌গে, শরীর থাকলে টাকা অনেক আসবে! এবার মাঠে যদি বৃষ্টি হয়,—অর্থাৎ দেবতা যদি মুখ তুলে চান,—তা হ'লে ঐ টাকা পূরণ হ'তে কতক্ষণ? বিভঞ্জনবাবুর কিছু ধেনো-জমি ছিল, তার আয়েই সংসার-রথ চলতো। একটি আধাসহরের কুচো জমিদার ছিলেন তিনি।

কিছুদিন মালগাড়ীর ঔষধ খেয়ে, একদিন বিভঞ্জনবাবু ভাবলেন, 'এবারে পরীক্ষা ক'রে দেখা যা'ক!' দোকান থেকে আড়াই-পো পাঁঠার-মাংস কিনে আনলেন। তিনি নিজে খাবেন আধসের,—আর ভার্য্যা নীহারিকা,—তাকেও তো চক্ষু-লজ্জার খাতিরে কিছু দিতে হয়!—সে খাবে আধপোয়া!

খাওয়ার পর বিকাল-বেলায় দেখেন, মালগাড়ীগুলো সব পেটের ষ্টেশনে আটকে আছে, আর তাদের সঙ্গে সঙ্গে অন্য-অন্য গাড়ী (যেমন, প্যাসেঞ্জার, ডাক-গাড়ী, পাইলট্) সব কিছু আটকে গেছে। শুধু যে মাংসগুলোই ওপর-পেটে গজ্ গজ্ করছে তা নয়,—তার সঙ্গে যতো ভাত, ডাল, তরকারী

খেয়েছিলেন, সব-কিছুই লাইনে আটকে পড়ে আছে। কি করেন? ট্রৈণন অনবরতই কট্ কট্ ক'রে কামড়াতে লাগলো। ভাল রেলওয়ে-এঞ্জিনিয়ারের মত, বিভঞ্জনবাবু গলায় আঙ্গুল দিয়ে লাইন পরিষ্কার করে দিলেন।

তিন টাকা ক'রে মাংস কিনে এনে, শেষকালে সেগুলো গেল একটা বেড়ালের পেটে। বিভঞ্জনবাবু ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে বেড়ালটার চেটে-খাওয়া দেখতে লাগলেন, আর ঈর্ষায় একেবারে কেঁদে ফেললেন।

বিপদ-ভঞ্জন নীহারিকা উপদেশ দিল, অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারীতে ও রোগ সারবে না। তুমি একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার দেখাও।

পাড়ায় একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ছিলেন. তিনি বড়ো ছোটো-ডাক্তার ন'ন! মানুষের রোগ-ভমিতে লাঙ্গল চালিয়ে, একটা টাট্টু ঘোড়া পর্য্যন্ত কিনে ফেলেছিলেন।

তাঁর কাছে যেতেই তিনি প্রশ্ন আরম্ভ করলেন। এই *Viva-Voci* একজামিন অত্যন্ত মৌলিক। তিনি আরম্ভ করলেন গোড়া ধ'রে।

—আচ্ছা, আপনি যখন জন্মেছিলেন, তখন আপনার মা'র প্রসব-বেদনা হয়েছিল?

—তা, কি ক'রে জানবো?

—আচ্ছা, জন্মাবার পরে কি আপনি চোখ্ পিট্ পিট্ করেছিলেন? না ককিয়ে উঠেছিলেন?

—তাতো মনে নেই!

—হুঁ! এসব মনে ক'রে রাখতে হয়! রাখলে, রোগ-নির্ণয়ের অনেকটা সুবিধে হোতো!

—আজ্ঞে, সে অনেকদিনের ঘটনা! অতো কি মনে থাকে?

—তা বটে!…আচ্ছা, ছেলেবেলায় কতো দুধ খেতেন?

—তা অনেক। মায়ের দুধ, গরুর দুধ,—তার ওপর আমাদের বাড়ীতে এক ধাইমা ছিল, তার বুকের দুধও,—

—থাক্। তা হ'লে বোঝা গেল, অনেক দুধ খেয়েছেন!… হুঁ! তা হ'লে ঐ জন্যেই এরোগ! বেশী দুধ খেলে কি মাংস হজম হয়? আমাদের শাস্ত্রে বলে, মাংস খাওয়ার পর দুধ খেতে নেই। কেন হজম হয়না ব'লে। ছেলেবেলায় অনেক দুধ খেয়েছেন,—তাই এখন মাংস হজম করতে পারছেন না!

ডাক্তার-বাবুর কথা বিভঞ্জনের বেশ মনে লাগলো। তাঁর বিশ্বাস জন্মালো ডাক্তার-বাবুর ওপর। তখন সকাতরে বললেন: কি উপায়, ডাক্তার-বাবু?

ডাক্তার-বাবু তখন হ্যানিমান্-বেদসংহিতা খুললেন। অনেক পাতা উল্টোলেন, অনেক পাতার কাণ-মোড়া সোজা ক'রে দিলেন। প্রায় আধ-ঘণ্টা নিশ্চঞ্চল অধ্যয়নের পর বললেন: আচ্ছা; আমি একটা ওষুধ দিচ্ছি!…এতে, ছেলেবেলায় খাওয়া দুধের দোষটা অনেকটা কেটে যাবে! সেই

মূল-দোষটা কেটে গেলেই মাংস হজম করতে পার্বেন!... মূল কাটলেই গাছ পড়ে!...শিশি এনেছেন?

—আজ্ঞে না, তা'তো আনিনি!

—আনেন নি? তবেই ত মুস্কিল!...আচ্ছা, আমি একটা ভাঁড় দিচ্ছি! এতে ক'রে ওষুধ দোবো, আপনি তা থেকে ঢেলে ঢেলে খাবেন।

ব'লে, আলমারির কোণ থেকে একটা মাকড়শার জাল-জড়ানো মাটির ভাঁড় বার ক'রে সেটা বেশ ক'রে ধুয়ে, কলসী থেকে জল গড়িয়ে পূর্ণ করলেন। পরে, তাতে তিন ফোঁটা ঔষধ দিলেন।

—এ ক'দিনে খাবো?

—তিন দিনে। অর্থাৎ, রোজ এই ভাঁড়ের তিন-ভাগের এক-ভাগ। দিনে একবার মাত্র ওষুধ খাবেন। দেখবেন যেন বেশী খেয়ে ফেলবেন না। বেশী খেলেই, এ ওষুধের আধ্যাত্মিক গুণটা একেবারেই চলে যাবে। থাকবে শুধু আধি-ভৌতিকটা।

—ভৌতিক মানে?...বিভঞ্জন ভয় পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

—অর্থাৎ, মাংসের যতোটা হজম হয়ে গেছে, সেটা থাকবে। কিন্তু যতোটা হজম হয়নি, সেটা হজম হবে না।

—বলি, এ ওষুধ খেলে একপোর বেশী মাংস খেতে পার্বো ত?

—নিশ্চয়ই। তা না হ'লে আর ভৌতিক গুণ বলবো

কেন? অর্থাৎ কিনা, একেবারে ভূলে তো কাজ কর্ব্বে।

বিভঞ্জনবাবু মহা সন্তুষ্ট হয়ে ভাঁড়টা হাতে ক'রে বাড়ী ফিরলেন। ভার্য্যা দেখে বললেন: দই কিনে আনলে নাকি?

—ওষুধ, ওষুধ; শিশি ছিল না ব'লে, ডাক্তার-বাবু দয়া ক'রে একটা ভাঁড়ে করে দিলেন।

নীহারিকা অনেক চেষ্টা করেও হাঁসির দমকা হাওয়াটাকে আটকাতে পারলেন না। কিন্তু তাঁকে হাঁসতে দেখে বিভঞ্জন-বাবু একেবারে গরম তেলে জল পড়ার মত চটে উঠলেন। বললেন: "মেয়ে মানুষ জাতটাই হলো বেতালা তবলা; কখন যে কি বোল বেরোয় তার ঠিক নেই।"

অনেক কষ্টে নীহারিকা হাঁসি থামালেন। বাবাঠাকুরের চন্নামেত্ত যেভাবে ভক্তিমতী হিন্দু-মহিলারা পান ক'রে থাকেন, বিভঞ্জনবাবু ততোধিক ভক্তি সহকারে সেই ঔষধ-ভাণ্ডটি প্রতিদিন নিয়মমত উদর-গহ্বরে নিঃশেষিত করলেন।

তিনদিনের ওষুধ ফুরিয়ে গেলে, ডাক্তারবাবুর কাছে গিয়ে আবার ওষুধ আনলেন। এবারে ভাঁড়ে নয়, শিশিতে। পনোরো দিন সভক্তি ওষুধ খাবার পরেই বিভঞ্জনবাবুর সেই পুরাণো বাতিকটা চাগ্‌লো; অর্থাৎ পরীক্ষা করতে ইচ্ছে হ'ল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই পরীক্ষার দিনে তিনি আধসের মাংস কোনও রকমে গলাধঃকরণ করলেন বটে, কিন্তু গলা ও পাকস্থলী এমন বিদ্রোহ আরম্ভ করলো যে,

তৎক্ষণাৎ বিভঞ্জনবাবু ঘরের চোর বাইরে বার ক'রে দিয়ে তবে নিস্তার পান।

অতি-বিমর্ষ হ'য়ে ভদ্রলোক আবার গেলেন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের কাছে। তিনি সকল কথা শুনে, রোগীর দুঃখে দুঃখিত না হ'য়ে, উলটে হো হো ক'রে হেসে উঠলেন। বললেন :—আপনি বলছেন, আমার ওষুধে আপনার কোনও উপকার হয়নি ? হা-হা-হা-হা ! এও কি সম্ভব ? বলি, পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে উদিত হতে পারে, কিন্তু আমার ওষুধ কখনও বন্ধ্যা হয় না।...আচ্ছা যাক্, আপনি যখন বলছেন, বিশেষ ফলপ্রদ হয় নি, তখন,—নিশ্চয়ই কোন গুপ্ত কারণ আছে ! (ব'লে চোখ বুজে একটু চিন্তা করলেন।)

—আচ্ছা বলুন তো, যে-ঘরে আপনি ওষুধের শিশি কি ভাঁড় রাখেন, সে-ঘরে কি কোনও মাথা-আঁচড়াবার চিরুণী রাখা হয় ?

—আজ্ঞে তা ধরুন,—শোবার ঘরেইতো ওষুধের শিশি রাখি, আর সেই ঘরেই আমার স্ত্রীর চিরুণী থাকে বৈ কি !

ডাক্তারবাবু তখন চোখ খুলে বললেন, ওঃ ! এত শীঘ্র যে কারণটা ধরা পড়বে, তা আমি ভাবিনি। যাক্, আপনার ভাগ্যি ভালো ! আর কখনও ও ঘরে ওষুধের শিশি রাখবেন না।

বিভঞ্জন অসভ্যের মত জিজ্ঞাসা করলেন :—কেন ডাক্তার-বাবু, তাতে দোষ হ'ল কি ?

—দোষ ? দোষ অনেক রকম। ধরুন, ঐ চিরুণীর গায়ে

চুল-টুল লেগে থাকতে পারে, শুখ্‌নো হয়ে গেলেই চুল বাতাস দিয়ে উড়ে গিয়ে, ওষুধের সঙ্গে মিশে আপনার পেটে যেতে পারে!

—তা কেমন করে হবে? আমার ওষুধের শিশি তো ছিপি-আঁটা থাকে!

—আরে মশায়, ওষুধ খাবার সময় তো ছিপি খুলে ঢালেন? সে সময় কি চুল মিশতে পারে না?

বিভঞ্জনবাবু ভ্রূ কপালে তুলে বললেন: হাঁ, তা-আ-আ হতে পারে বটে!

ডাক্তার-বাবু তাতেও তাকে রেহাই দিলেন না, আবার আরম্ভ করলেন: তা ছাড়া, মনে করুন, চিরুণীতে ত মেয়ে-ছেলেদের মাথার তেল লেগে যায়ই। তেলের একটা বাষ্প আছে! সেটা আমরা দেখতে পাই না, কিন্তু আছে! মানুষের আত্মার মতো! তেলের এই বাষ্পিক আত্মাটা ওষুধের আধ্যাত্মিক শক্তিকে নষ্ট করে দিতে পারে!

বিভঞ্জনবাবু তেলের "বাষ্পিক আত্মা" ও ওষুধের "আধ্যাত্মিক শক্তি" প্রভৃতি দার্শনিক কথাপ্রপঞ্চ শুনে একেবারে হকচকিয়ে গেলেন; ডাক্তার-বাবুর কাছ থেকে আবার ওষুধ কিনে এনে আরও তিনচার মাস চালালেন।

কিন্তু তবু খেতে গেলে একপোয়া মাংস কিছুতেই পাঁচ ছটাকে পরিণত হ'ল না। শেষে, অভক্তিতে নয়, পয়সার অশক্তিতে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ বন্দ করলেন।

কিন্তু রোগের খেয়াল মানুষের কাছে আলেয়ার মত। সেটা বাস্তবের ধার সব সময় ধারে না, বরং কল্পনার ধার অনেক সময় ধারে। কাজেই চিকিৎসক ও চিকিৎসার সন্ধান বিভঞ্জনবাবু আরও ক'রে যেতে লাগলেন।

দু'টো থাম পার হয়ে বিভঞ্জন গিয়ে পড়লেন তৃতীয় থামে, অর্থাৎ কবিরাজের পাল্লায়!

সকলেই বললে, ট্রেনে ক'রে পাঁচটা ষ্টেশন পার হয়ে গোপালপুরে গেলে, সেখানে যে একশো-বছরের বৃদ্ধ পুরাণো কবিরাজ থাকেন, তাঁর কাছে সারে-না হেন রোগ নেই!

বিভঞ্জনবাবু সেখানেই গেলেন। কবিরাজ মশায়ের মন্দিরে প্রবেশ কর্ব্বামাত্র, একজন লোক খবরদারি করলেন: কবিরাজ মশাইকে অসুখ দেখাতে এয়েছেন? দর্শনী এনেছেন?

—কতো? বিভঞ্জন জিজ্ঞাসা করলেন।

—ছ'টাকা স'ছ'-আনা: পাঁচটাকা কবিরাজ মশায়ের অবৈতনিক, স'পাঁচ-আনা দেবাদিদেব হন্তসুন্দরী বিগ্রহের,—আর এক আনা হ'ল, এই ঘর-ঝাঁট দেয় যে ঐ পরিচারকের।

—তার পয়সাও কি রুগীকে দিতে হবে?

—দিতে হবে না? না দিলে, ঘরে ঝাঁট পড়বেনা, তাতে আপনাদেরই ওষুধে ধূলো পড়বে। ক্ষতি হবে আপনাদেরই।

'—যাক্‌গে', মনে মনে এই নীতি অনুসরণ ক'রে বিভঞ্জন উক্ত খণ্ড ও অখণ্ড টাকাটা দিলেন।

তখন টিকিট পেলেন কবিরাজ মহাশয়ের নিকটে যেতে।

তিনি অনেক প্রশ্ন সুধাইলেন, অনেক হস্তের তলায় গর্ত খুঁড়িলেন এবং পরে রুগীর হাত ধরে নাড়ী অনুভব করতে বসলেন। চক্ষু দু'টি মুদিত হ'ল।

যতোটা সময় তিনি নাড়ী পরীক্ষা কর , ততটা সময়ে বোধহয় নাদির শা কি চেঙ্গিস্ খাঁ আর একবার এসে ভারতবর্ষকে ভেল্কী দেখিয়ে যেতে পারতো। যাহোক, বিভঞ্জন তাতে দুঃখিত হলেন না, বরং টাকার পুরো দাম উঠলো বলেই মনে করলেন।

কবিরাজ মশায় নানাবিধ পরীক্ষা ক'রে শেষে তাঁর জন্ম ব্যবস্থা করলেন "বৃহৎ-কণ্টক-কণ্টকিকা" ও ললাটে ধমনী-ব্যবচ্ছেদ।

এই শেষোক্ত প্রক্রিয়াতে বিভঞ্জনবাবুর যতোটা রক্ত-ক্ষয় হয়েছিল, তাতে তিনি আশা করেছিলেন এর পরে একপোয়া ছেড়ে এক সের পাঁঠার মাংস খেতে পাবেন।

কিন্তু বিধাতার এমনিই বে-বন্দোবস্ত যে বিভঞ্জনবাবু তুইমাস কবিরাজী চিকিৎসা করেও বি-চিকিৎসভাবে এই অবস্থায় রয়ে গেলেন। পাঁঠার মাংস কিছুতেই তাঁর প্রতি সদয় হ'লো না।

আরও ছুমাস ধ'রে কবিরাজ মশায়ের দাঁত-ভাঙ্গা নামের ওষুধ-পত্তর খেয়েও, যখন বিভঞ্জনবাবু রোগ-ভাঙ্গার কোনও উদ্দেশ পেলেন না, তখন তাঁর মনটাই শুধু গেল ভেঙ্গে। তিনি আর তাঁর কাছে যেতে অস্বীকার করলেন।

দিনকতক ওষুধপত্র সব বন্ধ ক'রে, রাগে ও বিরাগে রোগের খোঁজ-খবর নেওয়া বন্ধ করে দিলেন।

এই ভাবে কিছুদিন যায়। কিন্তু বেশী দিন গেল না। কেননা, রোগ-চিকিৎসার রাজপথে জুয়োর আড্ডা অনেক।

একদিন এক মুসলমান বন্ধু পাশের গ্রাম থেকে বিভঞ্জনবাবুর কাছে এলেন জমি-জমার বিষয় কিছু কথা কইতে। আলাপ-আলোচনার মাঝখানে একসময় তিনি বললেন: তাইতো দাদা? তোমার ছরীরটায় তেমন ছুবিধে দেখচি না কেন? *

—আর ভাই বলোনা। ভারি রোগে ভুগছি।

তারপরেই তাঁর অসুখের পূর্ণ বিবরণ, পূর্ণ বিশেষণের সহিত বিবৃত করলেন বন্ধুকে। বন্ধু সব শুনে বললেন:—

ওঃ! এতদিন আমায় ছম্বাদ দাও নি? আমার জানা এক অতি-উমদো হকিম আচেন; তিনি মরা মানুছকে জ্যান্তো করে দ্যান্ মাছের ভেতর দছ-বারোটা!

বিভঞ্জন প্রথমেই তেমন ঢলে পড়লেন না, কিন্তু ক্রমশঃই ঝড়ের মুখে কলাগাছের মত একটু একটু ক'রে ঝুঁকতে আরম্ভ করলেন।

* —"চলো চলো আমার ছঙ্গে ছেই হকিমের কাছে"। মুসলমান-বন্ধুটি ফুসলুতে লাগলেন। "তিনি ঠিক তোমার রোগ ছারিয়ে দেবেন। আমার ছছুর-মছাই পাঁচ মাছ ভোগেন জর-বিগারে। ওঃ! কি ছারাটাই ছারালেন তাঁকে হকিম-ছাহেব!"

উকিল জোরালো হ'লে মকদ্দমা জিত হতে কতক্ষণ লাগে?

* অনেক ইস্‌লাম-পন্থী 'শ' 'ষ' 'স'কে 'ছ'এর মত উচ্চারণ করেন।

দেখলেন, ঘরে চাল নাই। বাজারে কিনতে গেলেন, সেখেনেও দেখেন, চাল নাই। অথচ এই জিনিষটা না হ'লে শুধু টাকার ঠুং-ঠুং শব্দ শুনে, তিনি কি ক'রে প্রাণরক্ষা করেন?

ধরলেন এক বেলা অন্ন খেতে। শেষে তা'ও জোটে না। আটার রুটি খেতে আরম্ভ করলেন। তা'ও ক্রমশঃ বিরল হ'ল! তখন এলো রাজপুতানার বজ্‌রা! খাবামাত্র, মূর্খ উদর এমন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতে লাগলো যে, সেই সারবান্ জিনিষ খাওয়াও তিনি ছেড়ে দিলেন। বৎসরের মাঝামাঝি এমন অবস্থা হ'ল যে, শুধু পানা-পুকুরের কলমি-শাক ও ডাঙ্গার সজ্‌নে-পাতা হয়ে দাঁড়ালো বিভঞ্জন ও তাঁর পরিবারবর্গের একমাত্র খাদ্য-বস্তু।

ক্ষুধায় প্রাণ যায়! অনেকেই দেহ-পিঞ্জর পথের ধূলার ওপর ফেলে রেখে, শুধু আত্মাকে নিয়ে, নির্ঝঞ্ঝাট মহাশূন্যে বিলীন হতে লাগলেন।

বিভঞ্জনবাবুর ঊর্দ্ধতন সাতপুরুষের কিছু পুণ্য ছিল, তার জোরে তাঁকে অতোটা কর্ত্তে হলোনা। কিন্তু পিঞ্জরটা যে বেশ মোচড় খেলো তাতে আর সন্দেহ নেই।

এক-একদিন ক্ষুধার এতো জ্বালা হ'তো যে, তাঁর মনে হতো ইট-পাটকেলগুলো কুড়িয়ে খেলেও তিনি হজম করে ফেলবেন। এমন বে-আইনী কাজ অবশ্য তিনি কখনও করেন নি,—তবে তার জন্যে তাঁকে প্রশংসা করা যায় না, প্রশংসা কর্ত্তে হয় বাড়ীর উঠানের সজ্‌নে গাছকে আর বাগান ও পুকুরের হাব্‌জা-গোব্‌জা শাককে।

১৩৫০ কাটলো। তখনও তিনি কোনও রকমে শরীর ও প্রাণকে একত্র ক'রে রেখে দিয়েছেন, শুধু কপাল-খানার জোরে।

(৩)

১৩৫১ সালে নবান্ন এসে দেহ-পিঞ্জরের পাখীটাকে কোনও রকমে ডানা মুড়ে থাকবার অবস্থায় নিয়ে এলো। তখনও একবেলা বিভঞ্জনবাবু খাচ্ছেন।

জল থাকলেই তাতে ঢেউ ওঠে, জীবন থাকলেই তাতে বিবাহ, পুত্র-জন্ম ইত্যাদি সবই ঘটে। দেশের গ্রামে গ্রামে যেমন নীরব মৃত্যুর ভিড় চলতে লাগলো, তেমনিই সেই ভিড়ের মধ্যে মধ্যে জীবনের সরব অভিনয় আপনার নিষ্ঠুর, ঔদাস্যময় প্রেত-নৃত্য চালাতে লাগলো। মনুষ্য-সমাজের একদিকে আঁধার, একদিকে আলোক! একদিকে কান্না, একদিকে হাঁসি! এই কান্না-হাঁসির সমন্বয়ই সংসার! অঘ্রাণ মাসে হঠাৎ বিভঞ্জনবাবু পত্র পেলেন তাঁর শ্বশুর-বাড়ী থেকে শ্যালকের বিবাহে।

সেখানে নিমন্ত্রণ রাখতে গেলেন। এই একবেলা-খাওয়ার দিনে কে না যায়?

শ্বশুরেরা ধনীলোক। দুষ্ট গ্রামবাসীরা এমন কথাও বলে থাকে যে, যুদ্ধের সময় কন্ট্রাক্টরি ক'রে তিনি নাকি কয়েক লক্ষ টাকা স্বপ্নের ভেতর দিয়ে পেয়ে গেছেন। যুদ্ধের সময়ে কর্তৃপক্ষীয়েরা টাকার দিকে তাকাননি,—তাকিয়েছেন কাজের

দিকে। বাঁশের দাম দিয়েছেন, সোনার ওজনে। অনেক বিল পাশ হয়ে গেছে যার পিছনে কন্ট্রাক্টারের এক পয়সাও খরচ হয়নি। কাজেই আরব্যোপন্যাসের আলাদীন হাজারে হাজারে জন্ম নিলেন দেশের বিশেষ এক সম্প্রদায়ের মধ্যে।···বিভঞ্জন-বাবুর শ্বশুরও চালাকি ও ঘুষ-দেবতার মন্দিরে হত্যে দিয়ে আলাদীনের ভাগ্যলাভ করেছিলেন।···যা হোক, ছেলের বিবাহে তিনি বেশ ঘটা করলেন।

বউ-ভাতের দিন খেতে ব'সে, নানাবিধ নূতন নূতন ভোজ্য-দ্রব্য দেখে জামাতা বিভঞ্জনবাবুর মনে হলো তিনি হঠাৎ ভোজ-বাজিতে অন্নপূর্ণার হাতার উপরেই জিব দিয়েছেন। অনেকদিন আধপেটা খাওয়ার পর, নানাবিধ চর্ব্ব, চোষ্য দেখে বিভঞ্জনবাবু যেন হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পেলেন। সকলের চেয়ে বেশী আহ্লাদ হ'ল তাঁর,—যখন পরিবেষ্টা তাঁকে প্রায় সেরখানেক পাঁঠার মাংস পাতে দিয়ে গেল।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে-মানুষ জীবনে কখনও এক-পোয়ার বেশী মাংস খান নি,—যার জন্যে এত পত্র-পত্র, এতো ডাক্তার-কবিরাজ-হকিম, এতো খরচ পত্র,—সেই তিনি আজ পুরো একসের মাংস অবাধে ও আনন্দে গলাধঃকরণ করে ফেললেন। আনন্দ খুবই হ'ল!—অবশ্য ভয়ও কিছু হ'ল, পাছে অপরাহ্নে গলায় আঙ্গুল দিয়ে সেগুলিকে আবার বার করে ফেলতে হয়,—বা রাত্রে উদর-পীড়ায় কোন ডাক্তারের কাছে ছুটতে হয়!

কিন্তু এ দু'য়ের কিছুই ঘটলো না। একসের মাংস বেমালুম হজম হয়ে গেল। বিভূতনবাবু ত বিস্ময়ে অবাক্। তাঁর এত বড়ো রোগটা কি তবে সেরে গেল?

শ্যালককে কথাটা বললেন। তিনি কলকাতা থেকে এই বৎসরেই সবে এম, এ, পাশ করে এসেছেন। তিনি ভগিনী-পতির রোগ ও তাহার অবার্থ ওষুধের কথা শুনে বললেন:—দেখলে দাদাবাবু! দুর্ভিক্ষেও মানুষের কিছু উপকার হয়। কতকগুলো লোক অবিশ্যি মরে গেল বটে, কিন্তু যেগুলো যমের হাত ফস্কে এখানে টিকে রইলো, তারা আগুনে-পোড়া ইটের মত হ'য়ে গেল! এই দেখোনা, তোমাকে কোনও ডাক্তার, হোমিওপ্যাথ, কবিরাজ, হকিম, একপো'র বেশী মাংস খাওয়াতে পারেনি, কিন্তু দুর্ভিক্ষ এসে তোমাকে একেবারে একসের মাংস হজম করিয়ে দিলো!

বরাবর অতিরিক্ত খেলে, মানুষের কখনও ক্ষুধা হয় না। তাই মাঝে মাঝে উপবাস দিতে হয়। আমাদের শাস্ত্রে তাই অমাবস্যা, একাদশীর ব্যবস্থা!

মনুষ্য-বিড়াল

—: (*) :—

একযোড়া কপোত-মিথুনের মত, সমীরবাবু ও তাঁর স্ত্রী রাতুলা রায় বাস কর্ত্তেন কলকাতার এক নাতিবৃহৎ বাড়ীর ছোট্ট কোটরে,—যাকে আজকালকার প্রচলিত বাঙলাভাষায় বলে ফ্ল্যাট্ (*flat*)। ফ্ল্যাট্ কথাটা ইংরিজি হলেও বাঙলা-ভাষার যদি কোন অভিধান এটাকে অন্তর্ভুক্ত করতে বাদ দেয়, তা'হলে সেই অভিধানটি নিশ্চয়ই অসম্পূর্ণ ব'লে বাঙলার সাহিত্য-সারথিগণ অপছন্দ কর্বেন।

উক্ত ফ্ল্যাট্খানিতে ছিল মাত্র একখানি শোবার ঘর ও সম্মুখে একটু ছোট্ বারাণ্ডা, যার অর্দ্ধেকটা আবার দরমা দিয়ে ঘিরে রান্না কর্ব্বার জন্যে ব্যবহৃত হোতো।

বাড়ীতে আরও অনেকগুলি এইরকম ফ্ল্যাট্ ছিল, এবং আরও অনেক মনুষ্য-কপোত তাঁদের বাচ্চা-কাচ্চা ও ডিম্ব নিয়ে জীবন-যাত্রা চালিয়ে যেতেন। তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য অবিনাশবাবু।

তিনি থাকতেন একটি দোতলার ফ্ল্যাটে। দেড়খানি শোবার ঘর আর সংলগ্ন বারাণ্ডার দশমিক-দুই কি তিন অংশ রন্ধনের জন্য আলাদাভাবে সংবেষ্টিত। শোবার দেড়খানি ঘরে ভদ্রলোকের আড়াই গণ্ডা পুত্র, ডজনখানেক কন্যা এবং প্রায় সমসংখ্যক ভাইপো-ভাইঝি সমবেত হয়ে অতিকষ্টে

রাত্রি যাপন করতো। দিনের বেলায় অবশ্য রাজপথ, বাড়ী-ওয়ালার উঠান ইত্যাদি স্থানে তারা বেশ হাত-পা খেলিয়ে বেড়াতে পারতো।

এই প্রধান জন-ব্যূহের মধ্যে একটি বালক ছিল যে তার শারীরিক সক্রিয়তার গুণে অন্যান্য সকল বালক-বালিকা অপেক্ষা ফ্ল্যাট্‌গুলির সকল অধিবাসীরই বিশেষ লক্ষ্যের বস্তু ছিল। তার শারীরিক গঠনে মাংসপেশীর বিশেষ দৃঢ়তা ছিল, এবং লম্ফে-ঝম্ফে সে বিড়ালকেও পরাভূত ক'রে পারতো। ফুটবলের মত সে সঙ্কুচন-বিস্ফারণ-প্রবণ এবং লোহের মত পতনে-পীড়নে অটুট।

সমীরবাবুর ঘরের মধ্যে প্রায় সে আসতো, আর তাঁর পরিবার রাত্রলাকে কাকীমা ব'লে ডাকতো। বয়স বারো কি তেরো, কিন্তু তাই'লেও যৌবন-সুলভ লজ্জা কি ভদ্রতা-জ্ঞান তখনও তার দেহের লৌহবর্ম ভেদ ক'রে মনের মধ্যে যেতে পারেনি।

সমীরবাবুরা ছিলেন নিঃসন্তান ও ঘাড়ে-পড়া-বোঝা হ'তে একেবারেই মুক্ত। কাজেই প্রায়ই তাঁরা যেতেন থিয়েটার-বায়স্কোপ দেখতে, আত্মীয়-বন্ধুকে আপ্যায়িত করতে, কলকাতার অগণন সভা-সমিতির কোলাহল-কিচিমিচি উপভোগ কর্ত্তে। খুব কমদিনই সন্ধ্যাবেলায় তাঁরা বদ্ধ থাকতেন তাঁদের সীমাবদ্ধ ভৌগোলিক বাস-নির্দ্দেশের মধ্যে।

একদিন রবিবারে প্রভাতে, সমীরবাবু দু'খানা বায়স্কোপের টিকিট কিনে আনলেন। মতলব হোলো, অপরাহ্নে আধসের

মাংস এনে, আর একখানা ফির্পো কোম্পানীর বড় পাঁউরুটী যোগাড় ক'রে, উভয় খাদ্যই সুচারুরূপে রন্ধন ক'রে, পরে প্রস্তুত খাদ্য ঘরের মধ্যে ঢাকা দিয়ে রেখে,—তাঁরা বায়স্কোপে যাবেন! বায়স্কোপ থেকে রাত্রি সাড়ে এগারোটার সময় ফিরে সে-সকল আহার কর্বেন! তা'হ'লে বায়স্কোপ দেখে এসে আর নতুন ক'রে রাঁধতে হবে না, এবং ঐ বিরক্তিকর ব্যাপারটা না করতে হ'লে তাঁদের উপভোগটার মধুপান পূর্ণ মাত্রাতেই ঘটবে।

তাই হ'ল। বেলা পাঁচটা বাজতে না বাজতে শ্রীমতী রাতুলা রায় উনুনে আগুন দিয়ে মাংসটা চড়িয়ে দিলেন, ওদিকে সমীরবাবুও একখানা পাঁউরুটি কিনে এনে সেখানা খণ্ডিত ও মাখনাবৃত করলেন।

মাংসের গন্ধ বাড়ীওয়ালার সীমা-বাঁধন মানেনা। গৃহের দরজা-জানালা ভেদ ক'রে সমস্ত বাড়ীর হাওয়াতে লোভনীয় দ্রব্যের সুসম্বাদ প্রচার ক'রে দিল। দোতলার ফ্ল্যাটের সেই ছেলেটি (যেটি রাতুলাকে কাকীমা ব'লে ডাকতো) পাঁচবার ঘরের মধ্যে এসে খবর নিয়ে গেল, কাকীমা'রা কি রাঁধচেন এবং কোথায় যাবার যোগাড় কচ্চেন।

ঠিক সন্ধ্যা আটটার সময়, সুসিদ্ধ ও সুরক্ষিত মাংস ও পাঁউরুটি-টোষ্ট, ঘরের এক কোণে ঢাকা দিয়ে রেখে, সমীরবাবু ও রাতুলা বেরিয়ে পড়লেন বায়স্কোপে যেতে। যাবার সময়ে ঘরের দরজায় চাবি কুলুপ দিতে মোটেই ভুললেন না।

রাতুলার পাতানো ভাসুর-পুত্র (অর্থাৎ দোতলার ফ্ল্যাটের

ছেলেটি, তার নাম ছিল 'কচা') ওঁদের যাবার পরই একটু সবিশেষ চঞ্চল হয়ে উঠলো। তিনবার এসে কুলুপটা টেনে দেখলো কিছু সুবিধা কর্ত্তে পার্ব্বে কিনা, কিন্তু যখন বুঝলো সেটা দুঃসাধ্য ব্যাপার হবে, কেননা সেটা চপ্‌স্যের তালা,—তখন পাশ করা Surveyor এরমত জানালার দুর্ভেদ্যতা সে পরীক্ষা ক'রে দেখতে লাগলো।

জানালাটা ছিল বন্দ। একটা লোহার কাটি দিয়ে ছিট্‌কিনিটা অতিসহজে খুলে ফেললো ১২।১৩ বছরের ছেলে কচা। এদিকে বালকের লক্ষ্যও ছিল, বাড়ীর অপর ভাড়াটেদের মধ্যে কেউ না দেখে ফেলে।

ছিট্‌কিনি খুলতেই, জানালার কপাট খুলে গেল। তখন বাধা সৃষ্টি করলো লোহার শিকগুলো। কিন্তু মাংসের গন্ধ এত তীব্রভাবে তখন ঘরের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসছিল যে, কচা শিকের লোহাত্ব আর বরদাস্ত কর্ত্তে পারলো না। শিকের ফাঁকের মধ্য দিয়ে মাথাটা গলে কিনা প্রথমে চেষ্টা করলে, কিন্তু যখন দেখলে, তার নিজের মাথার হাড়গুলো এত কড়া যে কিছুতেই সেটাকে নরম ক'রে বেঁকিয়ে শিকের মাঝ-রাস্তায় ঢুকিয়ে দেওয়া যাচ্ছেনা,—তখন মাথার ওপর রাগ ক'রে দিলে শিক-দুটোকে দুই মোচড়! সঙ্গে সঙ্গে শিকগুলো বেঁকে গেল,'এবং মাষ্টার কচা অক্লেশে তার মধ্যে প্রথমে মাথা ও পরে সমস্ত অঙ্গ ঢুকিয়ে দিয়ে, এক মিনিটের মধ্যেই দেখলে সে তখন ঘরের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধিবাসী!

ঢাকাটি খুলে আধসের মাংস আর খানকত রুটি খেতে

তার বেশী সময় লাগলো না। বরং বেশী সময় লাগলো, কি ক'রে এই সৎ-কাযটা চাপা দেয়, তার ফন্দি উদ্ভাবন করতে।

শেষে একটা মতলব তার উর্বর মস্তিষ্ক থেকে গজিয়ে উঠলো। মাংসের পাত্রে খানিকটা ঝোল ভুক্ত-শেষ পড়েছিলো; কূটবুদ্ধি-রসিক কচা সেই ঝোলটুকু ছড়িয়ে দিল মাংসের পাত্র থেকে জানালা অবধি।

তারপরে কচা পরম সন্তোষ সহকারে বেরিয়ে গেল আবার জানালার শিকের মধ্য দিয়ে। পরে বাঁকানো শিক দু'টো সোজা করে দিলে গায়ের জোরে, ঘর থেকে বেরিয়ে।

যথাসময়ে সমীরবাবু ও তাঁর ভার্য্যা ফিরে এলেন বায়স্কোপ থেকে। রাত্রি তখন সাড়ে এগারোটা। রাস্তার দোকানগুলো প্রায় সব বন্ধ হয়ে গেছে, এমনকি খাবারের দোকান পর্যন্ত।

মনে কোনও রকম চিন্তা নাই, কেননা বেশ জানেন সন্ধ্যাবেলায় আধসের মাংস ও যথেষ্ট পাঁউরুটি ঢাকা দিয়ে রেখে গেছেন। কিন্তু যখন সমীরবাবু ঘরের কুলুপ খুলে ভিতরে ঢুকলেন, তখনই খাবারের উপর যে ঢাকাটি ছিল সেটি উলটানো দেখে,—এবং ঢাকার পশ্চাতে যে অমূল্যরত্ন ছিল, সেগুলি নিঃশেষ দেখে—সমীরবাবুর চক্ষু একেবারে কপালে উঠলো। পশ্চাদবর্ত্তিনী ভার্য্যাকে ডেকে বললেন: ওগো, সর্ব্বনাশ হয়েছে! ঢাকা খুলে কে সব খাবার খেয়ে গেছে।

—অ্যাঁ? সে কি? বলতে বলতে বাতুলা রায় এগিয়ে

—এ বেড়ালের কাজ! দেখচোনা, জানলা-অবধি ঝোল ছড়ানো!

—বাবা! বেড়াল বটে! বাঘের মাসী যা' বলে, এ ঠিক তাই। আচ্ছা, জানলাটা খুললে কি ক'রে? ওটাতে তো ছিটকিনি দেওয়া ছিল?

—হয়তো যাবার সময় তাড়াতাড়িতে ছিটকিনি দিতে ভুলে গিয়েছিলে!

—"ভুলে যাবো"? সমীরবাবু বললেন: "আমি স্কুলে মাষ্টারি ক'রে খাই! সম্রাট সের খাঁর ক'জন বেগম ছিল, তা পর্য্যন্ত মুখস্ত,—আমি ভুলে যাবো?

—ভুলে না গেলে বেড়াল কি ছিটকিনি খুলতে পারে? ওরা কি মানুষের মতো সিঁদকাটি চালাতে জানে?

—ভাড়াটে বাড়ীর বেড়াল, ওরা সব জানে! যারা পাঁচ-জনের লুঠ ক'রে খায়, তারা চতুষ্পদ হ'লেও চতুর বুদ্ধি হবেই হবে! চতুর বিশেষণটা ওদের সব বিষয়েই।

দু'জনে অনেক অনুমান-প্রমাণ ব্যাখ্যানা হ'ল, কিন্তু শেষে দু'জনেই মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। তখন কি খাবেন, এই ভাবনায় দু'জনে অধীর হয়ে পড়লেন। রাত্রিতে আর সে রাত্রে নতুন ক'রে রান্নার ব্যবস্থা কত্তে চাইলেন না, ওদিকে সমীরবাবুও দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে জানালেন, বাইরে খাবার দোকান সমস্তই বন্ধ।

সেরাত্রি বেচারীদের অনশনেই কাটলো। তারপর দিন সকাল হ'তে বিড়ালের ওপর ভীষণ পীড়ন আরম্ভ হ'ল।

পরদিন যখন সমীরবাবু খাওয়া-দাওয়া ক'রে, তাঁর দৈনন্দিন কর্ত্তব্যে, অর্থাৎ ছেলে-ঠেঙাবার দায়িত্ব-পূর্ণ কার্য্যে বাহির হয়ে গেলেন,—তখন কচা এসে দেখা দিল তার পাতানো কাকীমার কাছে।

—হাঁ কাকীমা, কালকে নাকি হুলো বেড়ালটা আপনাদের মাংস রুটি সব খেয়ে গেছে?

—হাঁ বাবা! কালরাত্রে আমাদের না-খেয়ে কেটেছে! বেড়ালটাকে শাসন করি কি ক'রে বল্ দেখি!

কচা বেশ বীর অভিভাবকের মত বললে: তার ভাবনা কি? এবারে যেদিন আপনারা খাবার ঢাকা রেখে কোথায়ও যাবেন, আমায় বলবেন, বেড়ালটাকে ধরে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে দেবো! দেখি ব্যাটা কেমন ক'রে আর খায়!

রাতুলা একটা যেন উদ্বেগের হাত থেকে পরিত্রাণ পেলেন। বড় খুসি হয়ে বললেন: তাই দিস্ তো বাবা! বাছা, কচা আমাদের বড় ভাল ছেলে! একটা সন্দেশ খাবি, কচা?

—"তা, তা, তা, তা"—কচা মাথা চুলকাতে লাগলো! তিনটি খানেকের মধ্যে একটি আতা-সন্দেশ কচা-চন্দ্রের মুখ-বিবরের পথ দিয়ে শূন্য-দেশে চলে গেল।

সিঁড়ির পেছনে গিয়ে সে যে হাঁসিটি হেঁসেছিল, সে সি নবাব সিরাজদ্দৌলার পরাজয়ে মীরজাফরও হেঁসেছিলেন না সন্দেহ!

বেশী দিন গেল না, দু-তিন দিনের মধ্যেই কাকিমা কচাকে

ডেকে বললেন: কই কচা, তুই যে বললি বেড়ালটাকে বেঁধে রাখবি?

—কেন, আপনারা কি আজ কোথাও যাবেন?

—হাঁ, বাবা,—আজ যাচ্ছি আমরা পিসিমাকে দেখতে ভবানীপুরে। বাসায় ফিরে এসে খাবো।...এই খানকতো ইলিস-মাছ ভাজা ঢেকে রেখে গেলুম,—তাই ভাবচি, যদি,—

—কিচ্ছু ভয় নেই, কাকীমা! আচ্ছা, আমি এখনই হুলোটাকে বেঁধে এনে আপনাদের ঘরের মধ্যেই রেখে যাচ্চি।

—আহাহা! কচা আমাদের বড় ভাল ছেলে!

রাঙুলার কৃতজ্ঞতার অবধি রইলোনা, যখন সত্য সত্যই শ্রীমান্ কচা বাসার ব্যাঘ্রাকার হুলো-বিড়ালটাকে ধরে এনে, তার গলায় দড়ি বেঁধে ঘরের জানলায় বেঁধে দিল! কচা পুরস্কার-স্বরূপ একখানা ইলিসমাছ ভাজা পেয়ে গেল।

নিরপরাধ বিড়াল বাঁধনের পীড়নে ম্যাও-ম্যাও করতে লাগলো, ওদিকে রায়-দম্পতি নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় পিসিমাকে দেখতে চলে গেলেন।

ফিরে এসে দেখলেন, আবার সেদিনকার মতো ঢাকা খুলে দুর্দ্দমনীয় বেড়ালটা সব মাছগুলো খেয়ে গেছে। বিড়াল বাঁধা নেই,—তার গলার দড়িটা ছিন্ন অবস্থায় সব অতীত ইতিহাস বর্ণনা কচ্চে!

তখন কচার ডাক পড়লো। কচা বললে: "আঃ কাকীমা, আপনি যে আমায় এমন একটা পচা দড়ি দিয়ে যাবেন, তা'

আমি কেমন ক'রে জান্‌বো? আমি দোকান থেকে খাবার আনতে বেরিয়ে গেছি, ফিরে এসে দেখি,—হুলোবেটা দড়ি ছিঁড়ে,—কোথায় যে পালা পালালো, বেটাকে খুঁজেই পাচ্ছিনে!—এ আপনাদের দোষ কাকীমা, কেন আপনারা পচা দড়ি দিলেন?

রাতুলা গালে আঙুল দিয়ে স্বীকার করে নিলেন তাঁদের নিজেদের অপরাধ।

—এবারে যেদিন যাবেন, কাকীমা, সেদিন আর বাছাধনকে দড়ি ছিঁড়তে হচ্চে না! একটা লোহার শিকলি কিনে এনে দেবেন তো!...কচা উপদেশ দিয়ে গেল।

মানুষ আপার পাল্লায় পড়লে বালকের দ্বারাও চালিত হয়। সমীরবাবু সত্যি-সত্যিই একটা লোহার শিকল কিনে এনে দিলেন।

চারদিন পরেই একটা বিশেষ কারণেই রাতুলা ও সমীর-বাবুকে সন্ধ্যাবেলায় বেরুতে হ'ল। সে কারণটা শুধু যে ব্যক্তিগত, তা নয়; একটা প্রকাণ্ড ভারতৈতিহাসিক ঘটনা। মহাত্মা গান্ধী সেদিন বঙ্গদেশের উদ্‌ভ্রান্ত-বুদ্ধিময় মাটিকে পবিত্র ক'রে নূতন বুদ্ধি-হীন পথে নিয়ে যাবার জন্যে কলকাতার এক বিশেষ পার্কে লেকচার দিচ্ছিলেন। ঐ অৰ্দ্ধেশ্বর মহা-মানবকে দর্শন ও কর্ণেন্দ্রিয়ের দ্বারা স্পর্শনের মহাপুণ্যার্জন হ'তে কি সমীর ও রাতুলা নিজেদের বঞ্চিত কর্ত্তে পারে?

কিন্তু সেদিন সমীরবাবু গঙ্গাতীর হ'তে এক সদ্যোধৃত ইলিস-মাছ কিনে এনেছিলেন। মাছটাকে না ভেজে ফেলে রাখলে,

নিশ্চয়ই তার অমৃত-স্বাদ নষ্ট হবে; কাজেই ভোজন-আরামের খাতিরে তিনি স্ত্রীকে বললেন, সেটা ভেজে রাখতে।

অপরাহ্ণে যখন সেটা ভাজা হচ্ছিল, তখন তার প্রলোভনী গন্ধ বাতাসের ভিতর দিয়ে বাড়ীময় সে-সম্বাদ প্রচার করে দিল। ফলে, কচা দু-তিনবার আসা-যাওয়া করলো, তাঁদের ঘরের সুমুখ দিয়ে।

মাছগুলি ভাজার পর, রাতুলা দেবী কচাকে ডেকে বললেন: কইরে কচা, তোর বেড়ালকে আজ লোহার শিকলটা দিয়ে বেঁধে রাখ্‌না।

—কেন কাকীমা, আজকে আপনারা কি কোথাও যাচ্ছেন?

—হাঁ বাবা, যাচ্ছি। এখনই ঘুরে আসবো। দেরি হবেনা।

—তা, যান না। আমি হুলোটাকে শিকল দিয়ে বেঁধে এনে আপনাদের জানলায় আট্‌কে রাখবো। কিচ্ছু ভয় নেই, আপনাদের একখানা ইলিস-মাছও সে বেটা ছুঁতে পর্‍ব্বেনা।

তাই হ'ল। হুলোবেড়াল লোহার শিকলিতে বন্দী হলো, রায়-দম্পতি গান্ধীজীর সুগন্ধি উপদেশ-সৌরভ আঘ্রাণ কর্ত্তে বেরিয়ে পড়লেন।

কিন্তু ফিরে এসে দেখেন, জানালায় লোহার শিকল অর্দ্ধেকটা গড়াগড়ি যাচ্ছে, আর তাঁদের মহাশত্রু হুলো অর্দ্ধেক অংশ গলায় নিয়ে দৃষ্টিপথ হতে অন্তর্হিত। ঘরের ভিতরে ঢুকেও উভয়ে প্রায় পুত্র-শোকে কাতর হয়ে পড়লেন যখন দেখলেন, হাঁড়ির মধ্যে যতগুলি ভাজা ইলিস-মাছ ছিল, সবগুলিই তাঁদের অপ্রাপ্য প্রদেশে প্রস্থান করেছে।

সমীরবাবুর গায়ের রক্তটা খানিকটা জল হয়ে গেল। অনেকক্ষণ পরে যখন একটু প্রকৃতিস্থ হলেন, তখন তাঁর তীব্র বিশ্লেষণ-শক্তি ব্যাপারটার গুপ্তরহস্যের মধ্যে একটু উঁকি মারতে লাগলো। তিনি বললেন : উঁহু! বেড়ালে কখনও লোহার শিকল ছিঁড়তে পারেনা। কেউ এটা কেটে দিয়েছে।

'কে দেবে?' নিরীহ রাতুলা প্রশ্ন করলো।

—কে যে দিল, সেইটেই হচ্ছে কথা। আচ্ছা, ঐ কচা ছোঁড়াটা নিজেই কেটে দেয়নি ত?

—তাতে ওর লাভ?···রাতুলা বললো।

—বলি, ইলিস-মাছ খাবার লোভ তো কারও হতে পারে! শুধু বেড়ালরাই তো ইলিস-মাছ খায়না। ও নিজে খেয়ে,— দেখাতে চায় যে বেড়াল খেয়ে গেছে!

রাতুলা এক বিঘত জিব বার ক'রে বললেন : কিযে বলো, তার ঠিক নেই। ভদ্দরলোকের ছেলে,—কতো দয়া ক'রে বেড়ালটাকে বেঁধে রাখে!

—আচ্ছা, কে বেড়াল, আমি শীঘ্রই এ সমস্যার উদ্ভেদ কচ্ছি।

(১)

মনে মনে কি-একটা মতলব খাড়া ক'রে সমীরবাবু দু-এক-দিন পরেই আবার আধসের মাংস কিনে আনলেন।

রাতুলাকে বললেন : দেখো, তুমি উনুনটা জ্বেলে মাংসটা চড়িয়ে দাও। ওর গন্ধে কচাটা এখানে ঘুর-পাক খেতে থাক্,— আর বেড়ালটাও ঘুরুক। মাংস রান্নার পর, তুমি কচাকে

বলো, আজ আমরা ভবানীপুরে একবার যাবো পিসেমশায়কে দেখতে, ফিরতে হয়তো একটু দেরি হবে। সে যেন বেড়ালটাকে বেঁধে দেয়।"

কথামত রাতুলা তাই কর্লেন। বেলা পাঁচটার সময়ে কচা বেড়ালটাকে বেঁধে এনে ওঁদের জানালায় আটকে দিল। তখন সমীরবাবু ও রাতুলা বেশ-ভূষা ক'রে বেরোলেন ভবানীপুরে যাবেন ব'লে।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই সমীরবাবু ও রাতুলা ফিরে এলেন বাড়ীতে। তখন কচা বাড়ীতে ছিলনা, তার মায়ের হুকুমে কি-একটা কিনতে দোকানে বেরিয়েছিল, এঁরা যে ফিরলেন সেটা সে জানতে পারলো না।

এদিকে সমীরবাবু মতলব-মতো ঘর খুলে, ঘরের মধ্যে ঢুকে, চৌকির তলায় নিজেকে লুকিয়ে ফেললেন। রাতুলাকে বললেন, "তুমি বাইরে গিয়ে দরজায় তালা-চাবি লাগিয়ে দাও। তারপর যাও, কোন লেডিস্ পার্কে গিয়ে প্রাণভরে হাওয়া খাওগে। ঘণ্টাখানেক পরে বাড়ীর কথা স্মরণ কোরো,—যেন ডানা বা'র ক'রে একেবারে উড়ে যেওনা। তাহ'লে এই ঘরেতে আমি প'চে মরে থাকবো।"

রাতুলা মতলবটা যেন কিছু-কিছু বুঝলেন। কিন্তু তিনি এই আয়োজনে একেবারেই সন্তুষ্ট নহেন, তাঁর বিশ্বাস এটা একেবারে একটা বাজে পণ্ডশ্রম হচ্চে। তাঁর স্বামী যাকে সন্দেহ কচ্চেন, সে কখনই এই নিন্দনীয় চৌর্য্যবৃত্তি করে না। স্বামীর মাথা খারাপ হয়ে গেছে, কয়দিনের খাবার-চুরিতে!

সুতরাং সমীরবাবুর কথায় তিনি ঔদাসীন্য দেখিয়ে বললেন : কি একটা পোকা তোমার মাথায় ঢুকেছে, সেটা কিছুতেই তোমায় ছাড়েনা! আচ্ছা, পরখ ক'রে দেখো। কিন্তু আমি ঠিক বলছি,—কচা,—

সমীরবাবু মুখে আঙুল দিয়ে সঙ্কেত ক'রে বললেন : চুপ, চুপ! তুমি সব পণ্ড কর্বে দেখছি। তুমি যাও দেখি বাইরে দরজায় কুলুপ দিয়ে। আর দেখো, যেন রাস্তায় কচার সঙ্গে না দেখা হয়!

রাতুলা একটু অপ্রসন্নভাবেই সমীরবাবুর কথামত বাহিরের দরজায় কুলুপ দিয়ে, বেরিয়ে পড়লেন।

তারপর আরম্ভ হ'লো গোয়েন্দাগিরির প্রথম অধ্যায়। চৌকির তলায় প্রবেশ করামাত্রই মিনিট খানেকের মধ্যে সমীর বাবু অনুভব করলেন, সেখানকার লুক্কায়িত অধিবাসী মশাদের প্রতিক্রিয়া। ব্যাঘ্রের ক্ষুদ্রতম সংস্করণ কোটি কোটি মনুষ্য-রক্তপায়ী মশক একসঙ্গে এসে তাঁকে আক্রমণ করলো যেভাবে গ্যালিভারকে ("Gallivers travels" নামক পুস্তকের নায়ককে) কোটি কোটি লিলিপুটিয়ান (Lilliputian) আক্রমণ করেছিল তাঁর নিদ্রিত অবস্থায়। সমীরবাবুর একবার ইচ্ছে হ'ল, মশারিখানা নিয়ে এসে তাইতে মুড়ি দিয়ে বসেন। কিন্তু পাছে দর্শন-শক্তির ক্ষতি হয়, বা আততায়ীকে দর্শনের পর পাছে স্পর্শনেরও অসুবিধা ঘটে,—এই ভয়ে তা' হ'তে সমীরবাবু বিরত হলেন।

কিছুক্ষণ পরে দেখেন, একটা বিছে গুটি গুটি পা ফেলে

তাঁর দিকেই এগুচ্ছে। ভাগ্যিস্ দেখতে পেলেন, তা না হ'লে এখনই যে তাঁর গোয়েন্দাগিরি আত্মহত্যা-গিরিতে পরিণত হ'ত, তাতে আর সন্দেহ নেই। সমীরবাবু অতিকষ্টে চৌকিতল হ'তে বেরিয়ে একটা ছেঁড়া জুতো কুড়িয়ে নিয়ে, আবার ভিতরে ঢুকে বিছেটাকে ধ্বংস করতে গেলেন। কিন্তু বিছাদেরও কিছু কিছু বুদ্ধি আছে; সে সেই বুদ্ধির জোরে, সেই মুহূর্ত্তে গোয়েন্দার ওপর গোয়েন্দা হয়ে কোথায় সরে লুকিয়ে রইলো, সমীরবাবু তা'কে খুঁজে পেলেন না।

তবু বসে রইলেন চৌকির তলায়। বিছের ভয়ে, এতবড়ো একটা আবিষ্কার ব্যর্থ কর্ব্বেন? কলম্বস্ প্রাণের ভয়ে আমেরিকা আবিষ্কার করতে পশ্চাৎ-পদ হয়েছিলেন?

অৰ্দ্ধঘণ্টা মশক-তাড়ন, কিছু কিছু রক্ত-দান, সতর্কভাবে বৃশ্চিক-পরিদর্শন ও মধ্যে মধ্যে আরশুলা মাকড়শা ইত্যাদি অসামাজিক জন্তুর অত্যাচার হ'তে আত্মরক্ষণের পর,— সমীরবাবু হঠাৎ শুনলেন জানালার ছিট্‌কানি-খোলার শব্দ! তারপরেই খুলে গেল জানালা স্বয়ং! সমীরবাবু ভাবলেন, এবার নিশ্চয়ই বেড়ালটা ঢুকবে! হাতে একটা খেঁটেবাঁশ বেশ বাগিয়ে ধরলেন। এ বাঁশটা সমীরবাবু আগে হ'তেই সঞ্চয় করে কাছে রেখেছিলেন।

কিন্তু এ কি হ'ল? এ তো বিড়াল নয়! কচা!

সমীরবাবু সাশ্চর্য্যে দেখলেন, কচা জানালার শিক বেঁকিয়ে মাথা গলিয়ে ভেতরে ঢুকলো। তা দেখে, সমীরবাবু আপাততঃ বংশদণ্ডের ব্যবহার মুলতুবি রাখলেন।

তারপর দেখলেন, কচা সটান গিয়ে ঢাকা খুলে মাংস খেতে বসলো। সে এক একখানা মাংস মুখের ভিতর পুরছে, আর সমীরবাবুর মনে হচ্ছে, একটা গাঁট্‌-কাটা তাঁর পকেট কেটে এক-একখানা হাজার টাকার নোট সরিয়ে ফেলছে। একজন অস্ত্র-চিকিৎসক বুঝি তাঁকে অজ্ঞান না ক'রে ছুরি দিয়ে তাঁর পাঁজরাগুলো এক-এক ক'রে কেটে বাদ দিয়ে দিচ্ছে। সমীরবাবু আর সহ্য কর্ত্তে পার্লেন না, অতি সন্তর্পণে চৌকির তলা হ'তে বার হয়েই ঝপাং ক'রে গিয়ে পড়লেন কচার ওপর।

: তবেরে বেটা বেড়াল !…আঁ! কচা, তুই ?

কচার ঘাড়ে তখন একটা লোহার হাত! কথা কইবে কি ক'রে ?

—চল, তোকে আজ পুলিশে দিয়ে আ… হতভাগা চোর! ঘুঘু দেখেছো, ফাঁদ দেখোনি ?

ঠিক এমনি সময়, ঘরের বাহিরে চাবি-কুলুপ …র শব্দ হ'ল, এবং রাতুলা ঘরে প্রবেশ করলেন। …বাবুকে কচার ঘাড় ধরে টেনে আনতে দেখে একেবারে …তভম্ব হয়ে গেলেন! তা'হলে সত্যি সত্যি কচাই চুরি ক'রে রোজ মাছ-মাংস-সন্দেশ খায়! উঃ! ছোঁড়াটা তা'হ'লে …চ্চা-ডাকাত!

সমীরবাবু বললেন: দেখছো, আজকে হাতে-নাতে ধরেছি। ওকে আজ পুলিশে ধরিয়ে দেবো!…রোজ রোজ কি এই চুরি সহ্য করা যায় ?

রাতুলা কোনও কথা কইলেন না। শুধু রুষ্ট, বিস্ময়-বিশুষ্ক বিরক্ত মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন।

(৪)

জিদ্ অনেক সময় অনেক অদ্ভুত রূপ ধারণ করে। এক ইঞ্চি জমির জন্যে কত লোক অপরের মাথা ফাটিয়ে রক্তপাত করে; আর সেই রক্তের দাগ নিয়ে মকদ্দমা চলে হাইকোর্ট অবধি। সেখানে বিচারের যে আচার চলিত আছে, তা'তে যারা সেখানে চার ফেলে বসে আছে (টাকা-মাছ ধরবার জন্যে), তাদের ঝুড়ি পূর্ণ হওয়ারই সমাচার শুনতে পাওয়া যায়। আসলে, দালাল হ'লো জিদ্।

কতো সহোদর ভাই জিদ্ ধ'রে মকদ্দমা ক'রে পৈত্রিক বাড়ী-ঘর-দোর আটর্নীমশাইদের হাতে তুলে দিয়েছেন, ভাই[illegible] ফাঁকি দেবার জন্যে। ভাই মানুষের যতোবড়ো বন্ধু তত বড়ো শত্রু।

মানুষের অন্যরকম জিদ্ও আছে। এক [illegible]-ব্যবসায়ী দোকানদার ভদ্রলোক তাঁর দৈনন্দিন হিসাব [illegible]াতে রাত্রি দুইটা অবধি পরিশ্রম করতেন। যতক্ষণ আধ-পয়সা অবধি না মিলচে, ততক্ষণ ছাড়তেন না। বলতেন, "মশাই, আমার দু'টাকার আলো বেশী পুড়ুক, তবু হিসেবের আধপয়সা যে এদিক্-ওদিক হবে, তা হতে দিচ্চি না!"···এও এক জিদ্।

সমীরবাবুরও জিদ্ ধরলেন কচাকে শাসন করতে। সে যতোটা মাছ বা মাংস চুরি করে খেয়েছে, তার দাম তোলবার জন্যে যে এ জিদ্, তা নয়। একটা চেংড়া ছোঁড়া, তাঁর মত একজন বহু-অনড্বান-শাসক মাষ্টার-মশাইয়ের চোখে ধুলো

দিতে থাকবে, এটা তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারলেন না।

সত্যি-সত্যি সমীরবাবু কচাকে টানতে টানতে একেবারে থানায় নিয়ে এসে হাজির।

মৌনতা মানুষের একটি প্রধান বর্ম। রাজ-নীতি ক্ষেত্রেও দেখা যায়, অনেক কূটনৈতিক রাষ্ট্র-দূত কি রাষ্ট্রনেতা মৌনতা অবলম্বন ক'রে তাঁদের উদ্দেশ্য বেশ সফল করে ফেলেন। জিহ্বা মানুষের যতো উপকার করে বা করেছে, জিহ্বার সংযম তার চেয়ে কম করেনা বা করেনি।

কচা পথে যেতে যেতে কোন কথা বললো না, শুধু পরিহিত কাপড়ের আঁচলে হাত দু'টো ও মুখখানা মুছে গম্ভীর ভাবে চলে এলো।

থানার দারোগাবাবু সমীরবাবুর নিকট সমস্ত অভিযোগ ও বিবরণ শুনলেন। শুনে বললেন : হাঁ, তাহ'লে ত নিশ্চয়ই ছোঁড়াটাকে জেলে পুরতে হবে। এই বয়েস থেকে চুরি করে শেখা!

কচা গম্ভীর ভাবে বললে : আমি চুরি করি নি।

দারোগাবাবু এক ধমক দিয়ে বললেন : চুরি করিস্ নি? উনি যে তোকে হাতে-নাতে মাংস খেতে-খেতে ধরে ফেলেছেন?

কচা বেমালুম বলে বসলো : আমি যদি মাংস খাবো, তাহ'লে আমার হাতে মাংসর দাগ কই? মুখে মাংস কই?

সমীরবাবু কচার কথা শুনে মহা চটে গিয়ে বললেন :— এ বড় হ'লে একটা গাঁট-কাটা ডাকাত হবে মশাই! দেখুন,

মাংস চুরি ক'রে না খেয়ে থাকিস্,—তবে ওঁর ঘরে ঢুকেছিলি কেন?

কচা তটস্থভাবে উত্তর দিল: কাকীমা ডেকেছিলেন ব'লে!

সমীরবাবুকে জিজ্ঞাসা হ'লো: আপনার স্ত্রী ওকে ডেকেছিলেন?

—মোটেই নয়! ও ধরা পড়বার পর আমার স্ত্রী বাইরে থেকে এলেন!

দারোগাবাবু কি-একটা ভাবলেন। ভেবে বললেন: কিন্তু ও যে মাংস খেয়েছে, তার সাক্ষী কই সমীরবাবু? বামাল-শুদ্ধু না ধরা পড়লে ত আমরা আসামীকে চালান দিতে পারি না।

সমীরবাবু বললেন: আমি হাতে-নাতে ধরেছি, আমিই সাক্ষী!

দারোগাবাবু আপত্তি তুলে বললেন: তাতো হয় না। আপনি ফরিয়াদী, আবার আপনিই সাক্ষী? আপনিই যে মিছে কথা বলচেন না, তারই বা ঠিক কি? ও বলচে মাংস খায়নি, আপনি বলচেন খেয়েছে। কাজেই একজন তৃতীয় ব্যক্তি সাক্ষী থাকা দরকার। প্রমাণ দিন, তবেতো চালান দেবো।

—আর কি প্রমাণ দেবো বলুন।

—আচ্ছা বেশ, আসামীর কাছে বামাল দেখান।

—বামাল ত ও পেটের ভেতর পুরে ফেলেছে!

—বেশ, ওর পেটের ভেতর আপনার মাংস আছে, প্রমাণ করুন।

—তাহ'লে ত পেট কেটে দেখতে হয়?

—কেন, পেট কাটতে হবে কেন? এখনই গিয়ে এক্স্‌-রে (X-ray) ফটো তোলান।

—X-ray ফটো? বেশ, তাই তুলাচ্ছি—চল্ ছোঁড়া আমার সঙ্গে! এখনই তোর পেটের ভেতরকার ফটো তুলিয়ে আনি।

(৫)

এক্স্‌-রে-মন্দির কলকাতায় অনেক আছে। প্রাচীন হিন্দুদের শিব-মন্দিরগুলোকে বোধ হয় শীঘ্রই এগুলো সংখ্যায় হারিয়ে দেবে। এখন এদেরই উন্নতির দিন, শিব-মন্দিরের নয়।

এ-জাতীয় একটি প্রতিষ্ঠানে সমীরবাবু আপত্তিকারী কচাকে টেনে নিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে প্রতিষ্ঠানের ডাক্তারের সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁর সমুদয় বিবরণ জানালেন। ডাক্তার-বাবু শুনে বললেন: হাঁ, এক্স্‌-রে ফটোতে মাংস খেয়েছে কিনা, জানতে পারা যাবে। মাংসের মধ্যে যে হাড়ের কুচি থাকে, সেগুলোর ছবি ফটোতে ওঠে। তাইতেই ধরা পড়বে।

—কতো টাকা খরচ লাগবে?

ডাক্তার-বাবু বললেন: বেশী নয়। চার-খানা ফটো

তুলতে হবে। একখানা পাকস্থলীর, একখানা ক্ষুদ্র-অন্ত্রের, একখানা মেঝো, আর-একখানা বড়ো নাড়িভুঁড়ির। বোল টাকা ক'রে হিসাবে তাহ'লে লাগবে চৌষট্টি টাকা!

— চৌ-ষ-ট্টি-টা-কা! বলেন কি মশাই! দেড় টাকা কি একটাকার চোরাই মাল উদ্ধার করতে লাগবে চৌ-ষ-ট্টি-টা-কা? মাপ করবেন মশায়!···ওটা তাহ'লে এখন থাক্!···নমস্কার! আসি মশায়!

—কি হ'লো?

সমীর ঘরের দরজার দিকে এগুতে এগুতে বললেন: না, এমন কিছু নয়! তবে, বুদ্ধির হাড় ভাঙ্গবে যখন, তখন আসবো আপনার কাছে X-ray করাতে! এখন থাক্!

(৬)

সমীর-বাবু সটান বাসায় ফিরে এলেন। ভার্য্যা জিজ্ঞাসা করলেন: কি হ'লো?

সমীর-বাবু অভিমান ক'রে বললেন: "আজকাল বিচারের যে-সব পদ্ধতি, তা'তে চোরের শাস্তি হবার আগে, যার চুরি হয় তারই শাস্তি হ'বে প্রথমে! তাই পালিয়ে এলাম।"

আগা-গোড়া বৃত্তান্ত সবিস্তারে জানালেন রাতুলারে তিনি একেবারে হতাশ হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: তবে উপায়?

—উপায়, এ-বাসা ত্যাগ ক'রে অন্য কোনও বাসায় পালিয়ে যাওয়া। এরকম ফ্ল্যাট্ বাড়ীতে বাস করার চেয়ে রাস্তার চৌমাথায় বাস করা ভাল! সেখানে তবু ভাড়া লাগবে না। সেইটেই লাভ।

—"তাহ'লে অন্য একটা বাসা খোঁজো।" ভার্য্যা রায় দিলেন।

সেদিন থেকে বাসা-খোঁজা আরম্ভ হলো। মানুষ ভগবান্‌কে হয়তো খুঁজে বার করতে পারে তপস্যার জোরে,—কিন্তু, কলকাতায় বাসা খুঁজে বার করা তার চেয়ে অনেক শক্ত। প্রতিদিন সকালে, বিকালে, রাত্রে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে কলকাতা সহর তুর্ম্মুস্ ক'রে বেড়ালেন, কিন্তু তিন মাসের মধ্যে একটা নতুন বাসা আহরণ করতে পারলেন না।

সমীর-বাবু তখন বললেন ভার্য্যাকে:—সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়।…না, না, রাতুলা! এইখানেই আমাদের থাকতে হবে, আর চুরি সহ্য করতে হবে। ঘর থেকে মাছ চুরি কি মাংস চুরি,—ওটা চুরি নয়। মনুষ্য-ঋণ পরিশোধ! আমাদের শাস্ত্রে আছে, মানুষ জন্মালেই তার তিনরকম ঋণ সঙ্গে সঙ্গে জন্মায়:—পিতৃ-ঋণ; দেব-ঋণ আর মনুষ্য-ঋণ!…আমরা যেচে মানুষকে তো কিছু দিতে পারি না, তাই ভগবান্ নিয়ম করেছেন, যারা প্রার্থী, তারা জোর ক'রে অপরের কাছে ঋণ-শোধ আদায় কর্ব্বে।…কচা চুরি করুক, কেননা কচার এ চুরিতে অধিকার আছে! আর আমাদের এতে পুণ্য-সঞ্চয়!

জ-বাবুর কাণ্ড।

(১)

নামে হাঁড়ি ফাটে, কিন্তু ভদ্রতা ফাটেনা। জ-বাবুর নাম লইয়া পাড়ার অনেকের হাঁড়ি ফাটিয়াছে, এমন অভিযোগ তাঁহার নামে অনেকেই করিয়াছে, কিন্তু সেজন্য তাঁহার ভদ্র-সমাজে স্থান একটুকুও ক্ষত হয় নাই। তবে তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর অজ্ঞের কারণে মৃত্যুর পরে, তাহা একটু চিড় খাইয়াছিল মাত্র।

চায়ের পেয়ালায় একটু চিড় খাইলেও তাহা ভদ্র-সমাজের টেবিলে চলিয়া যায়। এই নৈসর্গিক নিয়মে চিড়-খাওয়া নাম তখনও ভদ্র-তালিকাভুক্ত ছিল।

কৃপণ দুই প্রকারের আছেন। একপ্রকার—যাঁহারা ভিতরে অর্থাৎ নিজ পরিবার-বর্গের মধ্যে শোচনীয় ব্যয়-সঙ্কোচ করিলেও বাহিরের লোকের কাছে 'হাত-খোলা' ভাব দেখান। ইঁহারা চাপা-কৃপণ। কাজেই তাঁহাদের নাম তত ছড়ায় না। কিন্তু আর একপ্রকারের কৃপণ আছেন যাঁহারা ভৌগোলিক প্রভেদ না মানিয়া, সর্ব্বত্রই তাঁহাদের ব্যয়-সঙ্কীর্ণতার স্বভাব প্রকাশ করিয়া ফেলেন। শেষোক্ত প্রকারের কৃপণ ছিলেন জ-বাবু!

লোকে তাঁহাকে জ-বাবু বলিয়াই ডাকিত, পুরা নাম লইতে সাহস পাইত না। আমাদেরও সে সাহস নাই।

যখন তাঁহার প্রথম-পক্ষের স্ত্রী এই মর্ম্মান্তিক সংসার হইতে *Transfer* (ট্রান্স্‌ফর) গ্রহণ করেন, তখন মন্দলোকে অনেকে অনেক কথা বলিয়াছিল। কেহ বলিল, তিনি স্বামীর জ্বালায় উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছেন, কেহ বলিল, বিষ খাওয়াইয়া জ-বাবু খরচ বাঁচাইয়াছেন! ঠিক সে কি প্রক্রিয়ায় তিনি মারা যান, তাহা এখনও সন্দেহের বিষয় রহিয়া গিয়াছে। তবে তিনি যে একটা সন্দিগ্ধ কারণে মরিয়াছেন, একথা তাঁহার শত্রু বা মিত্র উভয়-পক্ষই স্বীকার করিয়া থাকেন।

ইহার পর তিনি আবার দার-পরিগ্রহ করেন। কিন্তু তাহা দার-পরিগ্রহ কি দ্বার-পরিগ্রহ, তাহা বুঝা ভার; কেননা, প্রথমা স্ত্রীর সন্দেহজনক মৃত্যুর পর, সমাজের যে-দ্বার তাঁহার নিকট বন্ধ হইয়াছিল, তাহা আবার খুলিয়া গেল।

পুনর্ব্বার বিবাহের সময়ে একটু গোলমাল ঘটিয়াছিল। ন্তু হিন্দু সমাজের রাজবৈদ্য ঘটকগণ মলম-যোগে জ-বাবুর াম্ভ দুর্নাম-ক্ষত অচিরাৎ সারাইয়া তুলিয়াছিলেন। বিবাহ- ফ গজাইয়া উঠিতে বিলম্ব ঘটে নাই।

এবার যিনি এলেন, তিনি দরিদ্র-কন্যা। সুন্দর ও সুগভীর ী তাঁহার জন্মস্থান। লজ্জাশীলা কিন্তু বিড়াল-স্বভাবা। াৎ, পশ্চাতের থাবা চুপি চুপি বাড়াইয়া খাবারের থালা তে মৎস্য আত্মসাৎ করিতে, তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। জ-বাবুর সংসার আবার হাঁসিয়া উঠিল বৈকালের ফুলের । বছরখানেক অতি-চমৎকার গেল। কিন্তু তাহার পরেই শেষের রজনীগন্ধার কুসুম-পত্র [illegible]

(২)

জ-বাবুর একটি বিশেষ দোষ ছিল, তিনি ঘুমাইয়া পড়িলে আর চাবির খবর রাখিতে পারিতেন না। কৃপণদিগের পক্ষে ইহা একটা Disqualification. (চাকরি রাখার পক্ষে অন্তরায়)।

জ-বাবু এই দৌর্ব্বল্যটাকে মেরামত করিবার জন্য অনেক প্রকার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোনটাই কার্য্যকরী হয় নাই। প্রথম প্রথম, লোহার সিন্দুকের চাবিটি কাপড়ের ট্যাঁকে তিন-চার-ফের করিয়া রাখিয়া দিতেন, কিন্তু ঘুম-শেষে দেখিতেন ট্যাঁকের মৃত্যু ঘটিয়াছে, এবং চাবি সেই শিথিল শব হইতে স্খলিত হইয়া আত্মার মতো শূন্যে মিশিয়াছে। ইহার পর, তিনি আর-এক কঠিনতর দুর্গে রাখিতে আরম্ভ করিলেন। মাথায় টিকি রাখিয়া, তাহার সহিত চাবিটি সূতা দিয়া বাঁধিয়া তিনি নিদ্রা যাইতে লাগিলেন,—কিন্তু হায়! তাহাতেও সূত্র বিশ্বাসঘাতকতা করিতে লাগিল: চাবির ভারে সূতা ছিঁড়িয়া যাইত, কি নিদ্রার ভারে চাবি ছিঁড়িয়া যাইত, তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেন না। নিদ্রাভঙ্গের পর চাবিকে অনাথ বালকের মতো, বিছানার যেখানে-সেখানে পরিভ্রমণ করিতে দেখিয়া, তাঁহার ভয়ের সঞ্চার হইল,—তিনি অন্য পন্থা অবলম্বন করিলেন।

কাপড়ের অঞ্চলে বাঁধিয়া রাখিলে দেখিতেন, কাপড় নিজেই এত স্বাধীনতা অবলম্বন করে যে, সে-বস্তুর নিকট চাবি গচ্ছিত রাখা মানে,—চৌমাথার রাস্তায় ফেলিয়া দেওয়া।

শেষে জ-বাবু ব্যবস্থা করিলেন, চাবি তাঁহার মাথার বালিশের তলায় রাখিয়া, তাহার উপর মাথা দিয়া, তবে নিদ্রা যাইবেন। যক্ষেরা নাকি এই প্রক্রিয়া খুব সহজ-সাধ্য অথচ কার্য্যকরী বলিয়া বিবেচনা করে।

মাসখানেক খুবই সুফল পাইলেন, কিন্তু তার পরে হঠাৎ আবিষ্কার করিলেন, তাঁহার লৌহ-সিন্দুকের অধিবাসী-গণ অজ্ঞাত-কারণে ক্ষীণতর হইতেছে। ইহার অধিক বিপত্তি কৃপণদিগের আর কি হইতে পারে?

কি করিয়া এই টাকা কমিতেছে? কেহ চুরি করিতেছে? হবেও বা! কিন্তু সে সাহসী ব্যক্তিটি কে? বৃদ্ধা পিসিমা কি এমন কাজ করিবেন? কিন্তু যে-বৃদ্ধা বাতে একেবারে উঠিতে পারেন না, তাঁহার পক্ষে লৌহ সিন্দুক খোলা ও বন্ধ করা সম্ভবপর কি?

বাড়ীতে পাচক-ব্রাহ্মণ রাখার মতো [illegible] নির্ব্বোধ অপব্যয়িতা আর নাই, (বিশেষ জ-বাবু বলিয়া [illegible], পাচক ভিন্ন-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ কি মোটে ব্রাহ্মণই নয়, কা[illegible] তাহার হাতে খাইলে, হিন্দু-ধর্ম্ম হইতে পতিত হইতে হ[illegible] এবং নরক অবশ্যম্ভাবী!) তবে একটি চাকর ছিল, কিন্তু [illegible]নিতান্তই বালক। আর-পক্ষের ছেলে-দুটি বাপের ধমকানিতে ঘরের ত্রিসীমানায় আসেনা। তবে কে চুরি করিতেছে? ঘরের মধ্যে আসে এক হুলো-বেড়াল আর বিশ্বপ্তমা স্ত্রী!, হুলো-বেড়াল যে লোহার সিন্দুক খুলিতে পারিবে, এমন বুদ্ধি-শক্তির কথাতো Zoologyতে (পশু-বিজ্ঞানে) লেখা নাই। তবে কি,—তাঁহার নূতন সহধর্ম্মিণী,—

না! না! তা কখনও সম্ভব নয়! অনেক কষ্টে, অনেক পয়সা খরচ করিয়া যাঁহাকে ঘরের কর্ত্রী করা হইয়াছে, তিনি যে রক্ষক হইয়া ভক্ষক হইবেন,—এমন দার্শনিক বৈপরীত্য তিনি তো তর্কের জোরে বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিলেন না। একটু একটু সন্দেহ হইলেও, তাঁহাকে কিছু বলিতে,—এমন কি জিজ্ঞাসা করিতেও—সাহস ঘটিল না! তিনিও যদি অভিমানে পূর্ব্ববর্ত্তী ভার্য্যার মত তাঁকে ফেলিয়া প্রস্থান করেন, তাহা হইলে তৃতীয়বার টোপর মাথায় দিবার কোন সম্ভাবনাই থাকিবে না! তাঁহার মনে হইল, দেশে যদি একটা পত্নী-*Insurance* (বীমা) কোম্পানীর আফিস থাকিত,—সেখানে মাসে কিছু কিছু টাকা জমা দিলে, স্ত্রী মরিলে তাহারাই স্ত্রী জোগাড় করিয়া দিবে, তাহার জন্য তাহারা গ্যারান্টি,—তাহা হইলে তাঁহার কি সুবিধাটাই হইত! অন্ততঃ এই চুরির জন্য তাঁহার স্ত্রীকে ...ু 'জিগ্যাশ-পড়া' করা চলিত!

যাহাহউক, স্ত্রীর উপর সন্দেহ যখন তিনি চে... করিয়াও মনের মধ্যে আনিতে পারিলেন না, তখন ...ার সন্দেহ বেঁক লইল অন্যদিকে। বেশ বুঝিতে পারিলে..., হয় চোঁড়া চাকরটা, না হয় তাঁরই আরপক্ষের শকুনি-টো এই কার্য্য করিতেছে। চিন্তা আসিল কি করিয়া প্রকৃত চোরকে ধরিবেন।

(৩)

পাড়ায় যে ডাক্তার-খানাটি আছে, তাহাতে কাজ করেন একটি ঝানু কম্পাউণ্ডার। মুখ নত করিয়া উপরদিকে আড়নয়নে

চাহিয়া চাহিয়া, ভদ্রলোকের এমন অবস্থা ঘটিয়াছে যে, চোখের চশমাখানি নাকের ডগাতেই প্রায় উদ্বন্ধনে ঝুলিতে থাকে। ভদ্রলোক ঠিক চক্ষের সম্মুখে চশমা ধরিলে কিছুই দেখিতে পান না।

মাথাটি দেখিলে মনে হয় চুণকাম-করা রাস্তা। সেখানে চুণেরদাগ ও ধূমের জমাট লম্বা লম্বা রেখা যেমন পাশাপাশি থাকে, ইহার মাথাতেও তেমনি পাকা ও কাঁচা চুল ঝগড়া না করিয়া পাশাপাশি বর্ত্তমান ছিল।

কুইনাইনের বড়ি পাকাইয়া অঙ্গুলগুলির প্রান্তভাগ এমন বর্ণ ধারণ করিয়াছে যে, সবগুলিকে একজনের বলিয়া বুঝা যায় না।

এই ভদ্রলোকের সঙ্গে জ-বাবুর অনেকদিনের আলাপ। বৃশ্চিক যেমন সর্প-শিশুর সহিত থাকিতে অভ্যস্ত, জ-বাবুও তেমনি এই কম্পাউণ্ডারের সাহচর্য্যে থাকিতে আনন্দ অনুভব করিতেন।

উভয়ে কথা হইতেছিল।

—লোহার সিন্দুক থেকে রোজ টাকা চুরি যাচ্ছে। কি করা যায় বলতো ওরনেশ বাবু?

অবিনাশ বাবু একটি বিড়ি টানিতে টানিতে বলিলেন: সে কি? জোঁকের গায়ে জোঁক বসে? আপনার সিন্দুক থেকে চুরি?

—তাইতো দেখচি। অথচ কে যে এ কাণ্ড কচ্চে, কিছুতেই ধরতে পাচ্ছিনে!

—বাড়ীর চাকর-বাকর হবে! ওদেরইতো মনিবের টাকা চুরি কর্‌বার জন্মগত অধিকার!

জ-বাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন: উঁহু! চাকর তো মোটেই নেই,—আছে একটা বাকর! আট-বছরের দুগ্ধ-পোষ্য শিশু!

অবিনাশবাবু নিভে-যাওয়া বিড়িটা কাণে গুঁজিয়া বলিলেন: গোখরো সাপের বাচ্চা, পুঁইডাঁটার মতো দেখতে হ'লেও, আপনার জাত-ব্যবসা ভোলেনা। ওদের ভেতর বাচ্চা-ধাড়ি প্রভেদ নেই।

—কিন্তু,—ধরতে তো পাচ্ছিনে!

—ওদের ধরবেন? আপনি? সৈনিক বিভাগের ক্যাপ্‌টেন, কমাণ্ডাররা বড়ো ধরতে পারে, তা আপনি?

—বলি, সেই জন্যেই তো তোমাকে জিজ্ঞেস কচ্চি! একটা উপায় বাত্‌লে দাও।

অবনেশবাবু কাণের বিড়িটা হাতে লইয়া আবার তাহা ধরাইলেন। তাহাতে দুইচার টান দিয়া কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন: আমি একটা পাউডার দিতে পারি। সেটা বড়ো ওস্তাদ্ তুক্।

—দাওনা ভাই, দাওনা ভাই!...বলিয়া জ-বাবু লাফাইয়া উঠিলেন।

ধূর্ত্ত অবিনাশবাবু বলিলেন: কিন্তু পাঁচটি টাকা লাগবে, ঠাকুরদের পূজার জন্যে।

—কোন্ ঠাকুরের পূজো আবার?

—সে নাম কর্‌বার যো নেই। মুখে তাঁর নাম উচ্চারণ

করলে, তুক একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। যেমন কুইনলের ওপর তেঁতুলের অম্বল খেলেই, আর তার উপকার পাওয়া যায়না।

—পাঁচ টাকা নয় ভাই, পাঁচ আনা দিচ্ছি, তোমার গ্রীনরুমের ঠাকুরের পুজো দিও।

—ও টাকাতো আমি ছোঁবো না। সেই ঠাকুর নেবেন। পাঁচ টাকার একটি পয়সা কম দিলে তিনি উদয় হন না।

—হন বৈকি, পুরুতঠাকুর ভাল করে ডাকলেই,—

—সোজা উপায় বললুম, এতেও যদি আপনি টানাটানি করেন, তাহ'লে আর কি হবে? পাঁচ টাকা বাঁচাতে পাঁচশো বেরুবে সিন্দুক থেকে। তখন টের পাবেন মজা।

জ-বাবু বড়ো মর্ম্মাহত হইলেন। পাঁচ টাকা! বাঁচিয়ে রাখলে পাঁচ-হপ্তার না হোক,—চার-হপ্তার বাজার-খরচ চলে যায়।

জ-বাবুকে চিন্তা করিতে দেখিয়া চিল-দৃষ্টি অবিনাশ বুঝিতে পারিলেন, নৌকাখানা বালির চরে আটকাইয়াছে, আর একটু ঠেলা দিলেই জলে ভাসিবে। সুতরাং কিছু ভোগ ধরিতে হইল। তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন: মশাই, কুটি বড়ো সোজা লোকের কাছ থেকে পাইনি।

জ-বাবু আর এক ধাপ উঠিয়া বলিলেন: "আচ্ছা ভাই, পাঁচ আনার জায়গায় না হয় পাঁচসিকে নাও।" মুখখানা অবশ্য কিছু কাঁচুমাচু করিয়া বলিলেন।

—উঁহু! আনা-সিকেতে এমন ওষুধ পাওয়া যায় না!...

মশাই, রেডিয়েমের নাম শুনেচেন? যাতে ক্যান্‌সার সারে? সেই ধাতু এই গুঁড়োর মধ্যে আছে! ভয়ানক দামী ধাতু! মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল একবার আমার কাছ থেকে কিছু গুড়ো চেয়ে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছিলেন! তিনিই আমায় বলেন, এর মধ্যে রেডিয়াম আছে।

...তা, ওতেত ক্যানসার রোগ সারে! ওতে চোর ধরা পড়বে কি ক'রে?

—ঐ তো! যাতে অতোবড়ো রোগ সারানো যায়, তাতেই আবার চোর ধরতে পারা যায়! সব ইলেক্‌ট্রিকের কাণ্ড!

—যাক্‌গে! সে সব কথা আমার জেনে দরকার নেই। তুমি ভাই তিনটে টাকা নিয়ে আমায় রেহাই দাও।

অবিনাশবাবু আরও লম্বা-চওড়া গুণকীর্তন আরম্ভ করিলেন; বলিলেন: রায় বাহাদুর গজেন্দ্র কুমার মল্লিকের বাড়ীতে যখন বিশ হাজার টাকার অলঙ্কার চুরি যায়,—তখন এই তুকের জোরে তিনি চোর ধরে ফেলেন! এতো সেদিনকার কথা! আপনি তাঁর সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞেস ক'রে দেখবেন, আমার কথা সত্যি কিনা!

—আমি কি বলচি সত্যি নয়?

—তিনি কতো পুজো দিয়েছিলেন, জানেন? পঞ্চাশটি টাকা ঝন্‌ ঝন্‌ ক'রে বার ক'রে দেন!

—আচ্ছা ভাই, স'র একটা টাকা বাড়িয়ে দিলুম। আর কথাটি নয়। তুকটা আমাকে দাও।

—সে কি আর এম্‌নি নেওয়া চলে? কাল সকালবেলায় গঙ্গা-স্নান ক'রে, একদম উপবাস ক'রে, চাপদাড়ি [illegible] আসবেন,—আপনাকে দিয়ে দোবো। কিন্তু বাকি একটা [illegible] রে দিতে হবে।

—আচ্ছা তাই হবে,—ওর জন্যে কি হয়েছে!

(৪)

তারপর দিন সকাল হইতে না হইতে, ডিস্‌পেনসারি খোলার অনেক আগেই, জ-বাবু গঙ্গাস্নান সারিয়া ও উদরকে ভিস্তির খালি চামড়ায় পরিণত করিয়া উ[illegible]।

কম্পাউণ্ডার অবিনাশবাবু আসিয়া ডিস্‌পেনসা[illegible]লিলেন, ও জ-বাবুর নিকট হইতে চারিটি টাকা,—(যেন তার অঙ্গ হইতে ছুরি দিয়া কাটিয়া কাটিয়া) আদায় করিলেন, ও পরে চাপা হাঁসির সৌজন্য করিতে করিতে, জ-বাবুকে একটি মোড়ক দান করিলেন।

জ-বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, এটা কি কর্ত্তে হবে?

অবিনাশবাবু চারিদিক চাহিয়া লইয়া, জ'বাবুর কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া, মৃদুস্বরে বলিলেন, এর ভেতরে কতক-গুলি মন্ত্রপূত গুঁড়ো আছে। এই গুঁড়ো একখানা কাগজের ভাঁজে করে কিছু কিছু নিয়ে টাকাগুলোর ওপর [illegible]ড়িয়ে দেবেন।

—তাহ'লে কি হবে?

—যে-চোর ঐ টাকায় হাত দেবে, তার হাতে নিশ্চয়ই ঐ গুঁড়োগুলো লেগে যাবে! তাহ'লেই,—হাঁ, হাঁ, টের পাবেন তিনি! (বলিয়া জিব বাহির করিয়া, চোখ উল্টাইয়া দেখাইলেন)।

কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জ-বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন : কি হবে তার ?

—কি হবে ? কি না হবে, তাই বলুন। হাতের আঙুলে লেগে থাকলেই কোন্ সময় খাবারের সঙ্গে পেটে যাবে। পেটে গেলেই,—হঁ্যা, হঁ্যা, টের পাবেন বাছাধন !

—পেটে গেলে কি হবে ভাই ?

অবিনাশবাবু চক্ষু বড়ো করিয়া বলিলেন : প্রথমে, পেট-ব্যথা, তারপরে বমি, অজস্র বমি,—তারপরে ভেদ !

—তাতে চোর ধরা পড়লো কি ক'রে ?

—এঃ ! আপনি দেখছি নেহাত্ বোকা ! যেদিন টাকা চুরি যাবে, সেদিন বাড়ীর ভেতর যে-কোন-লোকের যদি ভেদ-বমি হয়, তাহ'লে জানবেন, সেই হ'ল চোর ! এ একেবারে অব্যর্থ টোট্‌কা !

একটা সন্দেহ জ-বাবুর মনে হঠাৎ উদিত হইল, কিন্তু তিনি সাহস করিয়া তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। ওদিকে, অবিনাশবাবু এতো হড়র-বড়র করিয়া টোট্‌কার গুণ-ব্যাখ্যানা করিতে লাগিলেন যে, জ-বাবুর আর সে কথা পুনরায় স্মৃতি-পথে আসিল না। সন্দে া চাপাই পড়িয়া গেল।

(৫)

ওব্‌নেশ বাবুর নির্দ্দেশমত জ-বাবু গুঁড়ার মোড়কটি আনিয়া নিভৃতে লোহার সিন্দুকটি খুলিয়া, তাহার ভিতরের সমস্ত

টাকার উপরেই লাগাইয়া দিলেন। পরে সিন্দুক বন্ধ করিয়া দিয়া, হাতটি সাবান দিয়া তিনবার ধুইয়া, নিশ্চিত জয়-সম্ভাবনায় আনন্দে উৎফুল্লভাবে প্রাত্যহিক কার্য্য সমাপন করিতে লাগিলেন।

মধ্যাহ্ন-আহারের পর যখন কক্ষে আসিয়া শয়ন করিলেন, তখন তরুণী অর্দ্ধাঙ্গিনী অন্যদিনের মত গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। সুচতুরা দিবানিদ্রা এই সকল ঘটনা-সমন্বয়ের পরিস্থিতিতেই সাধারণতঃ মানুষকে দেখা দিয়া থাকে। এবং যাঁহারা স্ত্রীর সেবা-পরায়ণতায় সৌভাগ্যবান, তাঁহাদের নিকট এই দিবানিদ্রা নিশীথ-নিদ্রার গভীরতাকেও অনেক সময় পরাজিত করিয়া থাকে। কে না জানে, বাস্তব প্রকৃতি অপেক্ষা অঙ্কিত প্রাকৃতিক ছবি মানুষকে অধিক আকৃষ্ট করিয়া থাকে? নৈসর্গিক অপেক্ষা কৃত্রিমের প্রভাব বহুক্ষেত্রেই বলিষ্ঠ।

সেদিন, অনেকক্ষণ নিদ্রা যাইলেন জ-বাবু!

, দিবানিদ্রার গভীরতায় জ-বাবু স্বপ্নে দেখিলেন, তাঁহার চাকর (চাকরের ক্ষুদ্র সংস্করণ) তাঁহার মাথার তলা হইতে চাবি চুরি করিল, লোহার সিন্দুক খুলিল, টাকা চুরি করি... তার তারপর, ঘণ্টাখানেক যাইতে না যাইতেই তাহ... কি দ-বমি! স্বপ্নে শুনিলেন, বদমায়েসটা ওয়াক ওয়াক করিয়া করিতেছে ও বার-বার পাইখানায় যাইতেছে। তাহাতে নি যেন উঠিয়া থানায় গেলেন ও দারোগাবাবুকে ডাকিয়া নিয়া তাহাকে ধরাইয়া দিতেছেন। দারোগাবাবু যেন হার নাম ধরিয়া ডাকিয়া বলিলেন ঃ—দেখোনা একবার ঠ, ওঘরে কি কাণ্ড হচ্ছে!

ঘুমটা আধখানা ভাঙ্গিয়া গেল। চোখ্ রগড়াইয়া তিনি বলিলেনঃ কি কাণ্ড আর হবে? ও টাকা চুরি করেছে।

—তুমি ঘুম থেকে উঠে, এক্ষুনি ডাক্তার ডেকে আনো। নইলে বউটা যে মরে।

বউয়ের নাম কাণে যাইতেই জ-বাবুর স্বপ্ন ও ঘুম সবই ভাঙ্গিয়া গেল। চোখ খুলিতেই দেখেন, পাশে দাঁড়াইয়া বুড়ী পিসিমা!

—কি বলচো পিসি? বউ মরে, ওসব কি কথা?

—আর কি কথা? একবার দেখবে চলো, বউয়ের চোখ বসে গেছে, হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

'সে কি? সে কি?' বলিতে বলিতে জ-বাবু প্রায় অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় দৌড়িয়া পাশের ঘরে গেলেন। গিয়া দেখেন, সত্যই তাই। তাঁহার জীবনের একমাত্র যষ্টি বুঝি সত্যই টুকরো টুকরো হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে। আর কথাটি নয়! সঙ্গে-সঙ্গে দৌড়ালেন ডাক্তারের বাড়ী।

ডাক্তার আসিল, ঔষধ দিল। অনেক ইন্‌জেকসন করিল, কিন্তু রোগিনীর অবস্থা ক্রমশঃই খারাপের দিকে চলিতে লাগিল।

শুশ্রূষা করিতে করিতে জ-বাবুর নজর সহসা পড়িল রোগিনীর আঁচলের খুঁটে। তাহাতে যেন কি গেরো দিয়া বাঁধা রহিয়াছে। কৌতূহল বশতঃ খুলিয়া দেখেন,—কি সর্ব্বনাশ! তাহাতে পাঁচখানা দশটাকার নোট বাঁধা রহিয়াছে,

এবং সেই নোটগুলির ভাঁজে ভাঁজে অবিনাশবাবুর দেওয়া
তুক্ তখনও স্পষ্ট লাগিয়া রহিয়াছে।

জ-বাবু চমকিয়া উঠিলেন। তাহ'লে তো তাঁহার স্ত্রীই
টাকা চুরি করে! মাথা ঘুরিয়া গেল, কিছুক্ষণ চক্ষে আর
কিছু দেখিতে পাইলেন না।

খানিকটা প্রকৃতিস্থ হইলে, রোগিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন:

"সিন্দুক থেকে তুমিই টাকা নাও? আমাকে ব'লে নাওনা
কেন?"

রোগিনী ক্ষীণস্বরে বলিল: তোমায় বললে কি দিতে?
খনও একটা পয়সা হাত তুলে দিয়েছো?

—তুমি এ টাকা নিয়ে কি করো?

—কি আর কর্ব্বো? রোজ বাজার দোকান করাই। তা না
লে কি খেতে পেতুম?

—কেন, আমিত রোজ বাজার করে দিই?

—তুমি ত আনো. বাজারের ঝেঁটিয়ে-ফেলে-দেওয়া পাকা
পি-পাতা, কড়াইশুঁটির পাকা খোসা, আর মাছের আঁশ!
খনও একটুকরো সত্যিকারের মাছ এনে দিয়েছো?

জ-বাবু শুনিয়া স্তম্ভিত। তখন বেশ তাঁর হৃদয়ঙ্গম হ'ল,
নিই এই সর্ব্বনাশের প্রধান মূল।

ডাক্তার-বাবু আসিলে তাঁহাকে বলিলেন: মশাই, যতো
কা লাগে, দেবো! আপনি এ রুগীকে সারিয়ে তুলুন।

ডাক্তার-বাবু মুখ বেঁকাইয়া বলিলেন: আমিত যতদূর
রি চেষ্টা কচ্ছি, করবোও,—কিন্তু রক্ষা পাওয়া কঠিন।

কলেরা হ'লে আমার ওষুধেই এতক্ষণ চাঙ্গা হয়ে উঠতেন। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, এ কলেরা নয়!

--তবে?

— এ আর্সেনিক বিষ!

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই রোগিনী টাকা-চুরি করিবার প্রয়োজন হইতে চিরদিনের জন্য নিষ্কৃতি পাইলেন!

লাঔষধি

(একাঙ্ক নাটক)

—:(•):—

চরিত্র-পরিচয়

রুণা }
রুণা } ... দুই ভগ্নী।

মোদ ... ... বরুণার স্বামী।

মীর ... ... অরুণার স্বামী।

বন্ধু মিত্র ... ... বরুণা ও অরুণার পিতা।

ক ... ... সমীরের বাটীর ভৃত্য।

['ত' বর্গের অক্ষর 'ট' বর্গে ... করে। এবং দন্ত্য 'স' স্থানে 'ছ' উচ্চারণ করে। উপরের দন্ত-পঙ্ক্তির কিছু দারিদ্র্য-বশতঃ এইরূপ ঘটিয়াছে]

ক্কিং ... ... জগবন্ধু-বাবুর বাড়ীর ভৃত্য।

... ... সমীরের বাড়ীর তরুণী ঝি।

প্রথম দৃশ্য

সমীরের শয়ন কক্ষ। বিলাসী যুবকের স্বপ্নের
প্ররোচনায় গৃহটি সজ্জিত। ড্রেসিং টেবিলের
সহিত সংলগ্ন একখানি মধ্যমাকার মুকুরের
সম্মুখে দাঁড়াইয়া সমীর-চন্দ্র কেশ-
প্রসাধন করিতেছে ও গুন্ গুন্
করিয়া গান গাহিতেছে।

সমীর। (গীতান্তে, মুকুরে মুখ দেখিতে২) এঃ! ভ্রূ-তুটো যদি আর একটু লম্বা হয়ে, মাঝখানে এসে সেক্-হ্যাণ্ড (shake hand) করতো,—আর নাকটা,—হাঁ নাকটা,—যদি আর একটু সরু হ'য়ে নেমে এসে বাঁশীর মতো হোতো,—আর গাল দু'টোও যদি আর একটু টেবো-টেবো হোতো,—তাহ'লে মুখখানা কি চমৎকারই না দেখতে হোতো!...ভুল! ভুল! বিধাতার ভুল! লোকটা বোধ হয় আমাকে তৈরী করবার সময় একটু মাল-টাল টেনেছিল।—তা না হ'লে এত-বড়ো ভুলটা কর্লে!...করুক! আমি ও ভুল শুধরে নিয়েছি।...বেঁচে থাক্ পাউডার আর পেন্ট্! গায়ের রঙ-এর জন্যে একটু গোলমাল রয়ে যায়,—তা হোক্, পাউডারে অনেকটা কায়দায় এনে ফেলেছি। (পশ্চাৎ ফিরিয়া) কে ও?

[তক্ষকের প্রবেশ]

তক্ষক। আমি, ডাডা-বাবু!

সমীর। দের্ বেটা! কোথায় ভাবলুম অরুণা, না তুই! আমের বদলে আমড়া!...যা দেখি,—তোর বউদিদিকে একবার গিয়ে বলতো,—আমি ডাকচি।

তক্ষক। আচ্ছা, যাচ্ছি।

(প্রস্থান।

সমীর। (স্বগত) আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাই যে, ওকে ডাকতে ভয় কেন?—এমন husband (হাস্ব্যাণ্ড্) যার, সে নারী দিনরাত আমার কোঁচার খুঁট ধরে ঘুরে বেড়াবে না?

(তক্ষকের পুনঃ প্রবেশ)

তক্ষক। ডাডাবাবু! বউডিডি-মণি বললেন, এখন টিনি আছ্টে পার্ব্বেন না।

সমীর। (বিশেষ রুষ্ট হইয়া) কেন?

তক্ষক। টাটো আমি বলটে পারিনে। আমায় যা বললেন, আমি টাই বললুম।

সমীর। উঃ! মেয়েমানুষ এমন proud হতে পারে? ও নিজেকে fortunate ব'লে মনে করে না যে, আমি এমন একজন জুয়েল যুবাপুরুষ তাকে নিজে থেকে ডাকচি! ও কি মেয়েমানুষ নয়? Feminine or Neuter? (অভিমান ভরে চেয়ারে বসিয়া রহিল।)…(খানিকপরে) তক্ষক! তোর বিয়ে হয়েছে?

তক্ষক। (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) এজ্ঞে,—এ—জ্ঞে!

সমীর। হয়েছে?

তক্ষক। এজ্ঞে, পাপমুখে আর বলি কেমন ক'রে?

সমীর। তোর বউ তোকে খুব ভালবাসে?

তক্ষক। এজ্ঞে, খুব! একডিন একটা বেড়াল মারটে গিয়ে, আমাকেই ডৃ'ঘা ডিয়ে ডিলো।

সমীর। সেটা কি Love এর চিহ্ন?

তক্ষক। লাফ বাবু? বউ খুব লাফাতে পারে! একদিন আমার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে, পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে লাফ কেটে পাইলে গিয়েছিলো! একটুও লাগেনি, ডাডাবাবু, টার! টোমায় বলবো কি, একটুও ছোড়ে যাইনি কোটাও ছুঁড়ির!

সমীর। আরে, সে লাফ নয়, সে লাফ নয়! লাভ্,-লাভ্!

তক্ষক। ও? লাভ বলচেন? হাঁ, লাভ হয়েছে বৈ কি! ছুঁড়ি যখন পেটঠম আমাডের বাড়ীটে বউ হয়ে এলো, টখন আমার শ্বশুর-মশাই টাকে ডিছলেন টেরো ভরি রূপোর পাইজোর আর চুড়ি! আর একখানা চেলি কাপড়,—টা, ঢরুন না কেন,—টার ডাম হবে চার, পাঁচ টাকা।

সমীর। দের ইডিয়ট (idiot), সে লাভের কথা কে তোকে জিজ্ঞাসা কচ্চে?...বলি, সে তোকে ভালবাসে?

তক্ষক। এজ্ঞে, টা আর বাসেনা? এই ঢরুন না কেন, এই সেডিন আমাডের ডেশের এক লোকের কাছে আমার জন্যে ডু'টো সোনা পাঠিয়ে দিয়েছিলো। টাই খেয়েই টো আমার কলেরা ঢরে গেল!

সমীর। কলেরা তো ধরে গেল? তা' মরলি কই?

তক্ষক। এজ্ঞে, সেটা আপনাডের হাট-যশ।

[অরুনার প্রবেশ। মাথায় অল্প একটু ঘোমটার মার্জ্জনা-ভিক্ষা।]

অরু। আমায় ডাক্‌ছিলে?

সমী। হাঁ। তার তো তুমি খুব খাতির দেখালে?

অরু। কি কর্ব্বো বলো। রান্নাঘরে তরু... কুটছিলুম। সেখানে মা ব'সে। কিক'রে বলতে-না-বলতে ছেড়ে আসি বলো।

সমী। আসবার ইচ্ছে থাকলে, অনেক ছুতো ক'রে আসা যায়। আসল কথা, আসবার ইচ্ছে নেই। (তরুকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া) তুই এখেনে দাঁড়িয়ে কি কচ্চিস্? এখন বাইরে যা!

তরু। এজ্ঞে—হি-হি—

(প্রস্থান)

অরু। তোমরা আমাদের ওপর বড়ো জুলুম করো। সংসারের কাজ-কর্ম্ম নেই, শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা-শুশ্রূষা নেই, সর্ব্বদাই তোমাদের রসের পেয়ালায় যোগান দিয়ে থাকতে হবে! তা কি কেউ পারে?

সমী। পারে, যাদের মনের ভেতর ভালবাসার ফুল ফুটে থাকে। তোমার তা নেই, তাই পারো না।

অরু। কেন, আমার মনটা কি কেবল বাবলা ...ের কাঁটা দিয়ে ভর্ত্তি দেখো?

সমী। তা'ছাড়া আর কি? সমস্ত দিনের ভেতর তো আকাশের নক্ষত্রের মতো অদৃশ্য হয়েই আছো। আর রাত্রেও যটুকু দেখা দাও, সেটুকুও তো ঘুমের গাঢ় মেঘে একেবারে ঢাপা।

অরু। যে যারে না দেখতে পারে,—তার চলন দেখে ...কা!

সমী। হুঁ! কাটা-কাটা জবাবটি ঠিক আছে! Love (লাভ্) জন্মাবে কি? মেঠো পাঁকে কি গোলাব-ফুল ফোটে?

অরু। অতো-শতো জানিনে বাপু! এখন কি দরকার, তাই বলো, করে বাচিচ। আমার অনেক কাজ পড়ে রয়েছে।

সমী। অরু? Husband wife এর দরকার কি শুধু কাট-করমাসে? দেখোদিকি, কেমন চাঁদ উঠছে পূব আকাশে! কেমন মলয়-বাতাস স্বর্গের অপ্সরীর মতো নেচে নেচে,—

অরু। (ঠোঁট উলটাইয়া) তুমি 'রবিঠাকুর' হয়ে ও-সব ব'সে ব'সে দেখো। আমি চললুম,—আমার কাজ আছে।

(প্রস্থানোদ্যোগ)

সমী। (দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া) উঃ! এই নীরস, নিপ্রেম নারী আমার জীবন-সঙ্গিনী! তার চেয়ে, বাবা যদি আমাকে এক তেঁতুল-গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিতেন,—তাহ'লে হয়তো একটু রস পেতুম! কিন্তু এ অসহ্য!.. দেখো অরুণা! তার চেয়ে তুমি বাপের বাড়ী গিয়ে থাকোতো,—তাহ'লে এই হেনস্থা আর আমাকে দহ্মাতে পার্ব্বে না।

(অভিমান-ভরে প্রস্থান)

অরু। কোন্‌দিক্ সামলাই? এঁর মন রাখতে গেলে তো তাড়ির কলসী হয়ে, ওঁর গলায় অনবরত ঝুলতে হয়!···মানুষ হ'য়ে তা কি পারা যায়?

(তক্ষকের প্রবেশ)

তক্ষ। বউডিডি? বউডিডি? বাইরের ঘরে কে এচেছে বলো ডেখি?

অরু। কে এসেছেরে?

তক্ষ। ছেই যে,—যাঁর বাড়ীটে গিয়ে আমরা লেডিগিনি, নটুয়া, ক্ষীরের টক্‌টি পেট ভরে খেয়ে এছেছিলুম,—ছেই নি!

অরু। কার বাড়ীতে খেয়ে এসেছিলিরে? খুলেই বল্ না।

তক্ষ। বুঝটে পারলে না? ছেই যে,—যাঁর ছেয়ালের াজের মটো এই এটোখানি পুরু গোঁপ!

অরু। খুলে বল্ বাপু! তোর হেঁয়ালি বুঝতে পারিনে।

তক্ষ। হি-হি-হি-হি! টোমার বাবা মছাই এছেছেন!

অরু। (শশব্যস্তে) বাবা এসেছেন? সত্যি? দেখি, দেখি!

(দ্রুত প্রস্থান।

তক্ষ। (সম্মুখের দিকে তাকাইয়া) ও ভুটি? ভুটি? র্যচিচ্?

[ভুতি ঝিয়ের প্রবেশ]

ভুতি। কেরে ড্যাকরা? ডাকছিস্, তুই? আমি বলি, ঝ একটা প্যাঁচা, ঘরের ভেতর থেকে ঘোঁত ঘোঁত কচ্চে!

তক্ষ। ঐ, মাইরি, টোর বড়ো ডোষ! আমায় টুই ভো ট্টা কচ্ছিছ্!

ভুতি। ঠাট্টা কর্ব্বোনা? তুই যে আমার ভগ্নীপোত হ'স!

তক্ষ। ভগ্নীপোট? যাঃ, ঐজন্যে টোর ছঙ্গে কটা কইটে নে! কেন, টোর বোনের ভগ্নীপোট বলটে পারলিনে?

[ভুতি চারিদিকে তাকাইয়া, কেহ কোথায়ও নাই দেখিয়া, হিল ও মাঝে মাঝে তক্ষকের গালে ঠোনা মারিতে লাগিল]

গীত (দ্বৈত-সঙ্গীত)

ভূতি। ওরে মোর ভগ্নীপতি, বাপের জামাই,
ব্যাটার মেশোমশায়!

তক্ষ। কেন, পেটের ছেলের বোলটে বাবা,
বাঁধলো কোন ভাছায়?

ভূতি। তোর দাঁত নেই, তাই কর্ব্বোনা বিয়ে,
পান-সুপুরি খাবি কিসে
(মোর) মুখ থেকে নিয়ে?
আমি মাংস খেয়ে হাড়টা দিলে,
পড়বি কোন দশায়?

তক্ষ। ডাঁট নেই, টায় টোর টো ছুবিধে,
কামড়াবোনা টোর গটরে ডাঁট দিয়ে বিঁধে,
কড়াই-ভাজা, দেখিয়ে মজা,
খাবি একা গাল-ঠেসায়?

ভূতি। তবে, রইলো কথা কাল হবে বিয়ে,
উঠবে তখন, তোর পেছনে, লেজটি গজিয়ে!

তক্ষ। ডেশে আমার বউ রয়েছে,
টা না হ'লে টোরে কে চায়?

দুজনে। আয় তবে আয়, দু'জনাতে
নাচি মজার ভালবাসায়।

তক্ষ। (সম্মুখ দিকে তাকাইয়া) নাঃ! ভাল কাজের ভারি ফ্যাছাদ্! যেই একটুকু জমে এছেছে,—অমনি বউড়িডি আর টার বাবা-ছালা এইদিকেই আছছে!

ভূতি। ওরে বাবা!

(উভয়ের দ্রুতবেগে প্রস্থান)

[অপর দিক দিয়া জগবন্ধু-বাবু ও অরুণার প্রবেশ]

জগ। তাহ'লে তোমার বাক্স-পেঁটরা সব গুছিয়ে নাও মা! আমার গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। এখনই যেতে হবে।

অরু। সে কি বাবা? এক্ষুনি?

জগ। হাঁরে! কাল বাদে পরশু বিয়ে। আমার ছেলেবেলাকার এক বন্ধু লাহোরে চাকরি করেন। সাতদিনের ছুটি নিয়ে এসেছেন মেয়ের বিয়ে দিতে। পাত্র না [illegible] শেষকালে আমার অপাত্রের হাতেই মেয়ে সঁপে দিচ্ছেন।

অরু। ওমা? সে কি? আমাদের [illegible] কটি ভাই,—[illegible] বিয়ে। আমরা অন্ততঃ একমাস ধ'রে [illegible]

জগ। তোরা একমাস ধ'রে আমোদ [illegible] [illegible] মেয়ের মোট নামিয়ে দিয়ে যান।

অরু। আমাকে নিয়ে যাবার আগে আমার শ্বশুর-[illegible]শুড়ীকে জিজ্ঞেস ক'রে নিয়েছো বাবা?

জগ। হাঁ, হাঁ, সে আর তোকে বোলে দিতে হবে। … [illegible]মি এখেনে এসেই আগে ওঁদের জানিয়েছি। ওঁরা [illegible]নন্দে [illegible] দিয়েছেন। জামাইয়ের সঙ্গেও দেখা হয়েছিল বাইরের [illegible]ঠকখানায়, ওকেও বিশেষ ক'রে বলে গেলুম!

অরু। ঐ যে, আসচেন এদিকে!

জগ। আমি তাহ'লে বৈঠকখানায় একটু অপেক্ষা করিগে। [illegible]ই মা তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে নে! আমার হাতে অনেক কাজ!

(প্রস্থান)

(অপর দিক দিয়া সমীরের প্রবেশ)

অরু। আমার ভাইয়ের বিয়ে পরশু। বাবা নিতে এসেছেন। যাবো তো?

সমী। (নীরব, যেন শুনিতে পায় নাই)।

অরু। আচ্ছা, এতো অল্পতেই রাগ করলে চলে কি ক'রে? রান্নাঘর থেকে আসতে একটু দেরী হয়েছে, এইতো? গেরস্থ-ঘরের বৌ-ঝিরা কি ফায়ার-ব্রিগেড্ (Fire Brigade)? যখনই হুকুম আসবে, তখনই হাজির দিতে হবে?

সমী। মনে প্রেমের ফুল না ফুটলে, এইসব আপত্তি আগাছার মতো গজিয়ে ওঠে।...আচ্ছা, দেখা যাক্, কতোদিন তুমি আমাকে এইভাবে অপমান করো।

অরু। অপমান? কেমন ক'রে তুমি এতবড়ো কথাটা আমাকে বললে?

সমী। যাক্। আর কথা বাড়িয়ে দরকার নেই। বাপের বাড়ী যাচ্ছ,—যাও! তুমি গেলে, হয়তো আমি কিছুদিন নির্ব্বিকারে,—হয়তো বা সুখে-শান্তিতে,—দিন কাটাতে পারবো।

অরু। বাবা অপেক্ষা কচ্চেন বাইরের ঘরে, সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবার জন্যে।...তুমি তাহ'লে মত দিলে যাবার জন্যে?

সমী। আমার মতে তোমার কি আসে যায়? তুমি ঘরের দেওয়ালকেও এ কথাটা জিজ্ঞাসা কর্ত্তে পারো।

অরু। আবার সেই রাগারাগি? দেশলাইয়ের কাঠির

মত একটু ঠুকলেই অমনিই জ্বলে ওঠো ?... আচ্ছা, তোমার বুদ্ধি-সুদ্ধি কি,—তোমার পায়ে ধরচি।

[অরুণা সমীরের পায়ে পড়িল]

সমী। কেন বিরক্ত কচ্ছ, এ কথা নিয়ে? বলছিতো, যাও।

অরু। আমার মাথা খাও,—অবিশ্যি ক'রে বউভাতের দিন অন্ততঃ নেমন্তন্ন রাখতে যেয়ো।

সমী। (নিরুত্তর)

[অরুণা আবার পদতলে হাত দিয়া প্রণাম করিয়া বিমর্ষভাবে চলিয়া গেল]

সমী। (উচ্চৈঃস্বরে) তক্ষক ? তক্ষক ?

[তক্ষকের প্রবেশ]

তক্ষ। এজ্ঞে ?

সমী। এক বাক্স কাঁচি সিগারেট কিনে আনতো।

তক্ষ। এজ্ঞে,—বাক্চো খুলে, গুণে নিয়ে আস্বো তো ?

দ্বিতীয় দৃশ্য

সমীরদের বাড়ীর সম্মুখের রাস্তা

তক্ষকের প্রবেশ।

তক্ষ। বউর্‌দিদি যেদিন ঠেকে বাপের বাড়ী গেছে,—সেদিন ঠেকে ডাডাবাবু যেন বাছুর-ছাড়া-গাইয়ের মটো লাপ্‌পে লাপ্‌পে* বেড়াচ্ছে।...আর হরডম্ ছিগ্‌রেট টানচে! আজ ছকাল ঠেকে টিন বাক্‌ছো এনে ডিয়েচি, আবার বলে, "টক্ষক, ছিগ্‌রেট নিয়ে আয়!" যাই, এই নটুন

*লাফিয়ে লাফিয়ে।

বাক্সটো নিয়ে যাই! দাঁড়াও বাবা,—ঢুটো ছিগ্রেট এর ভেটর ঠেকে ছরিয়ে রাখি! একটা আমার জন্যে,—আর একটা,—হি, হি,—ভুটির জন্যে!

[সিগারেটের বাক্স খুলিয়া, তাহা হইতে দুইটী সিগারেট লইয়া, একটী তখনই ধরাইয়া টান দিল।]

উ-উ-উঃ! আঃ! বড়লোক ছালারা কি মজায় খায়! যাই আবার ছিগ্গির ছিগ্গির! ডাডাবাবু আজকে বোধ হয় যাবে ছছুরবাড়ী ছালার বিয়ের নেমণ্টন্ন খেটে! আহাহা! আমায় যডি ছঙ্গে নেয়! টাহ'লে বেছ্ নিডিগিনি, খাজা-গজা,—ওরে বাবা! ডাডাবাবু আছছে!

(দৌড়িয়া প্রস্থান)

সমীরবাবুর প্রবেশ।

সমী। আজ তিনদিন গেছে বাপের বাড়ী,—অথচ একখানা Love-letter আসবার নাম নেই! নাঃ! নিশ্চয়ই এর ভেতর গোলমাল আছে! True love থাকলে, কখনই মেয়েমানুষ দীর্ঘ-নিঃশ্বাস post না ক'রে, থাকতে পারে না! বিরহ-যন্ত্রণা খামের মধ্যে ক'রে পাঠাতেই হবে! নাঃ! নিশ্চয়ই কোন Secret-lover তার আছে, যাকে সে ভালবাসে! নিশ্চয়ই! তাহ'লে আমাকে শ্বশুর-বাড়ীতে নেমন্তন্ন রাখতে যেতেই হবে! সেখেনে গিয়ে খুব কৌশলে বার করতে হবে কোন্ বদমায়েসটার সঙ্গে সে চুপি চুপি প্রেমের দুধ খাচ্ছে! আমাকে গোয়েন্দাগিরি করতেই হবে!…হাঁ, নিশ্চয়ই!

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান :—জগবন্ধু মিত্র মহাশয়ের বাটীস্থ একটি কক্ষ।

প্রমোদ, বরুণা ও অরুণা উপস্থিত।

প্রমোদবাবু একখানা পালঙ্কে শয়ন করিয়া আছেন। স্ত্রী বরুণা ও শ্যালিকা অরুণা গৃহের মধ্যে বসিয়া গল্প করিতেছে।

প্রমোদ। বলি, হাঁ পনেরো-আনা? তুমি কি তোমার আগেকার চাকরি একেবারেই ভুলে গেলে?

অরু। তার মানে?

প্রমোদ। না, চাকরি কথাটা বলা আমার এখন উচিত হয়নি; কেননা, এখন তুমি অপর এক ভদ্রলোকের মাননীয়া মহিষী!...আমার বলা উচিত ছিল, পবিত্র পরোপকার-বৃত্তি!

অরু। অর্থাৎ?

প্রমোদ। অর্থাৎ,—পাকাচুল নামে যে-সব অকাল-শত্রু বিনানুমতিতে আমার ছেলেমানুষ-মাথাটিকে আক্রমণ কচ্চে, সেই সব অর্ব্বাচীন-গুলোকে উৎপাটিত করা তো তোমারই একচ্ছত্র কারবার ছিল। তবে এতদিন পরেও, তুমি সে কার্য্যে শৈথিল্য দেখাচ্চ কেন? (মুখে মুখে কবিতা রচনা করিয়া)।

এসো এসো ভগ্নীসমা ওগো অর্দ্ধ-ভাৰ্য্যে?

কৃপা করি লেগে যাও পুরাতন কার্য্যে।

বরু। থামুন থামুন কবি ভারতচন্দ্র মশাই, থামুন! এখন আর আমার ভগ্নী অবিবাহিতা বা no man's land নয় যে, তাকে যে-কেউ বাইরের লোক এসে যথেচ্ছ ব্যবহার কর্ব্বে!

প্রমোদ। প্রশ্নটা আইনের মার-প্যাঁচে পড়লো! তবেই তো!

অরু। না দাদাবাবু, ভয় নেই। আমি এ জন্যে আইন-আদালত কর্বো না। দিদির কথায় আপনি ভয় পাবেন না! (অগ্রসর হইয়া) নিন, মাথা ঠিক ক'রে রাখুন, পাকাচুলগুলো গুষ্টি-শুদ্ধু তুলে দিচ্ছি!

প্রমোদ। এইতো, এইতো! একেই বলে, "ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়!" তা' না হ'লে তোমার এমন সু-বুদ্ধি হয়! (স্থির হইয়া শুইয়া) এই নাও, মাথা ঠিক করলুম, যদিও তোমার দিদির বিস্ফোরণে ওখানে অনবরত ভূমি-কম্প চলেছে।

বরু। সেটা আমার বিস্ফোরণে নয়,—নিজের বদ-খেয়ালিতে!

প্রমোদ। (কাণ ঢাকিয়া) তোবা, তোবা! এতবড়ো গালাগালিটা তুমি আমায় দিলে,—বিশেষ, তৃতীয় পক্ষের সুমুখে?

বরু। তৃতীয় পক্ষ? অরু কি তোমার তৃতীয় পক্ষ?

প্রমোদ। হাঁ, তা বৈ কি! এ খাঁচায়-পোরা পাখীটির দুইপক্ষ তুমি তো সুতো দিয়ে বেঁধে রেখে দিয়েছ! কাজেই, এই তৃতীয় পক্ষের সাহায্যে আমাকে আবার আকাশে উড়তে চেষ্টা করতে হবে!

বরু। উড়তে চাও, ওড়ো! কিন্তু এ পক্ষটি বড়ো বিপক্ষতা কর্বে, মনে রেখো!

প্রমোদ। নিরপেক্ষ হওয়ার চেয়ে বিপক্ষ ভালো। জানো তো, তরণীসেন বিপক্ষতা ক'রে ভগবান্ রামচন্দ্রকে পেয়েছিলেন?

বরু। তুমি বুঝি তাই অরুর ওপর এতো পক্ষপাতী?... যাক্! আগেতো, পাকাচুলের জন্যে অরু পয়সা পেতো,—একগাছা পাকাচুল দু'আনা দরে। এখন কি দর?

প্রমোদ। এখন পাকাচুলের দুর্ভিক্ষ নেই!...এখন অরুকেই গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে জঙ্গল সাফ কর্ত্তে হবে।

বরু। কেন, ওর কি বয়ে গেছে?

প্রমোদ। তা না হ'লে, ওর দিদিকে জঙ্গলে বাস কর্ত্তে হয়। ওকি বোন হয়ে, বোন্‌কে বনবাসে দিতে পার্ব্বে?

অরু। না দাদাবাবু! তোমাকে এখন আর দাম দিতে হবে না। আগে অনেক পয়সা খেয়েছি,—এখন ফাউ ব'লে বিনা-দামেই তুলে দেবো!

(অরুণা প্রমোদবাবুর মাথা হইতে পাকাচুল বাছিয়া তুলিয়া দিতে লাগিল।)

প্রমোদ। এসময়ে একটা সিগারেট খেলেও তুমি বোধ হয় রান্না-ঘরের কষ্ট অনুভব কর্ব্বেনা?

অরু। (হাঁসিয়া) রান্নাঘরের কষ্ট আমার সহ্য হয়েছে, দাদাবাবু! আমিত এখন হিন্দু গেরস্ত-ঘরের বউ!

প্রমোদ। তবে আর কি! (সিগারেট ধরাইয়া খাইতে লাগিল) ওঃ! বিবাহ হিন্দুনারীর পক্ষে একটা ম্যাট্রিকুলেশন এক্‌জামিন! কতো শিক্ষাই না হয় তাতে!

[সমীরের বীরদর্পে প্রবেশ ও অরুণাকে প্রমোদবাবুর মাথা হইতে পাকাচুল তুলিয়া দিতে দেখিয়া, গৃহের চৌকাঠের উপরই স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল।]

সমীর। (আপন মনে) উঃ! আমি পাকাচুল তুলে দিতে বললে, উনি একগাছিও খুঁজে পাননা! আর, ভগ্নী-পোতের মাথা থেকে পট্ পট্ ক'রে তুলে দেওয়া হচ্ছে!···হুঁ! এর ভেতর বেশ একটু অর্থ আছে!

বক। (সমীরকে দেখিয়া) এই যে সমীর এসেছো! এসো, এসো, ভেতরে এসে বসো।

প্রমোদ। (দেখিয়া) তাইতো! তুমি যে দেখি মহারাজ দুষ্মন্তের মতো গাছের আড়াল থেকে অভিনয় আরম্ভ কর্লে! এসো, এসো, ভেতরে এসো! (কবিতা-ছন্দে)

এসো হে নূতন!
উষা-আগমনে আঁধারের মত
লুপ্ত হউক পুরাতন!

সমীর। (তখনও আত্মস্থ) হুঁ! আবার সিগারেট খাওয়া হচ্ছে! কই, এখনতো সিগারেটের ধোঁয়াতে অরুণার দম আটকে যাচ্ছে না! আর আমি সিগারেট খেয়ে ধোঁয়া ছাড়লেই, ওনার মুখ-চোখে পানি ঝরতে আরম্ভ হয়!···এর ভেতরেও বেশ একটা নিগূঢ় কারণ আছে! হুঁ!

বক। তুমি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে যে হে কর্ত্তা? শ্যালীকে দেখে কি তপস্যার কথা মনে এলো নাকি? ভয় নেই গো ভয় নেই। আমি বাঘও নয়, ভাল্লুকও নয় যে, গপ্ করে গিলে ফেলবো!

সমী। (মাথা চুলকাইতে ২) না,—না,—তা নয়—তা নয়,—

(ভিতরে প্রবেশ করিয়া একটি চেয়ারে বসিল)

বরু। দেখো ভাই সমীর! অনেকদিন ফাঁকি দিয়েছো! আজ আর তোমায় ছাড়চিনে! আজ একখানা গান তোমাকে শোনাতেই হবে!

সমী। আজ্ঞে, আমিতো গান জানিনে!

বরু। ওসব ন্যাকামো এখেনে চলবেনা; আমি হার-মানিয়মে সুর দিচ্চি। তুমি গান ধরো দেখি।

সমী। সত্যি আমি গান গাইতে জানিনে। ঐ অরুণাকে জিজ্ঞাসা করুন।

বরু। শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল!...তাঁরে অরু? তোর বর গান গাইতে জানে না?

অরু। (দুইদিকে তাকাইয়া) গান জানেও বটে, জানেনাও বটে! তোমাদের দিকে তাকালে বলবো, জানে না, ওঁর দিকে তাকালে বলবো জানেনা!

প্রমোদ। অর্থাৎ, তুমি শ্যামও রাখবে, কুলও রাখবে। তা যাক্, দেখো, Shakespeare বলে গেছেন, যারা গান শুনে মুগ্ধ হয় না, তারা মানুষ খুন কর্ত্তে পারে। কিন্তু যারা গান গাইতে জানে না,—তাদের বিষয়ে যে তিনি কি বলে গেছেন,—তা আমার জানা নেই।

বরু। আমার মনে হয়, যারা এই গান-ময় পৃথিবীর মধ্যে থেকে গান গাইতে জানে না,—তারা সব আঁবের আঁটি!

এমন রসাল জিনিষের মধ্যে থেকেও তাদের মধ্যে রস ঢুকতে পায়নি,—তারা সব নীরস !

প্রমোদ। Bravo ! বেশ বলেছো বরুণা ! নাঃ সমীর ! এর পরে আর তোমার গান না গেয়ে থাকা চলে না ! এমন রস-সমাজে নীরস উপাধি কে চায় ?

সমী। (অপ্রস্তুত হইয়া) আচ্ছা, গাচ্ছি।

গীত

অশোক-বনে দেখে এলাম কাহার মহিলা,
অশ্রু-ধারায় গাঁথে ধরায়, মুকুতা-মালা !
চারিদিকে চেড়ীর বাহিনী,
শোনায় তারে মন্দ কাহিনী,
কে বুঝিবে একাকিনীর মরম-জ্বালা ?
রঘুনাথের সমীপে তাই কহি নিরালা।

প্রমোদ। গানটি কি তোমার পতঞ্জলের ইতিহাস, সমীর ?

সমী। আজ্ঞে না,—এটি ভূষণদাসের যাত্রা শোনা !

প্রমোদ। গানের মানে করলে বেশ বুঝতে পারা যায়. শ্রীমান্ হনুমান নিবেদন করেছিলেন রামচন্দ্রকে !···কাজেই তোমার এ আসরে গানটি গাওয়া মানে,—তুমি যেটা নয়, সেইটে প্রতিপন্ন করা !

সমী। (স্বগত) কি এতবড়ো কথা আমাকে ? লুকিয়ে লুকিয়ে আমার ফুল থেকেই মধু খাচ্ছেন, আর আমার বোঁটাতেই ঠাকুর !···হুঁ ! এর ভেতর বেশ একটা ষড়যন্ত্র আছে দেখছি !

...নাঃ! এখেনে আর বসা চলে না! এর শোধ নিতে হবে! ...প্রতিশোধ! (হাতের হাত-ঘড়ির দিকে তাকাইয়া, প্রকাশ্যে) উঃ! চারটে বেজে গেল!...আমায় তাহ'লে মাপ করুন আপনারা! আমি একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা কত্তে যাবো। আসি, নমস্কার!

(সহসা উঠিয়া প্রস্থান)

বন্ধু। সেকি কথা? না, না, শোনো,--শোনো,—ও সমীর? সমীরবাবু?

প্রমোদ। মনে হয়, ভদ্রলোক বেশ রাগ ক'রে চলে গেল!

বন্ধু। চলে যাওয়ার কর্ত্তা ভদ্রলোক নয়,— ভদ্রলোকের খেয়াল। কখন আর কিসে যে তার পাখা গজালো, বুঝতে পারলুম না।

প্রমোদ। আমার বিশ্বাস, আমার দু'একটা মন্তব্যে ভদ্রলোকের মনের ভেতর পোকা ঢুকেছে!...অরু? লক্ষ্মী-দিদিটি! যাও ওঁর পেছনে পেছনে! পোকাটিকে মন থেকে বার করে দিয়ে এসো। নইলে উটি বিছে হয়ে বেশ একটা কামড় দিতে পারে।

অরু। মাপ করো দাদাবাবু! আমি ঐ আগুন নিভাতে, জলের বালতি নিয়ে পেছনে পেছনে দৌড়োদৌড়ি কর্ত্তে পারবো না। উনি দপ্ ক'রে জ্বলেই আছেন।

বন্ধু। ঠিক বলেছিস্ অরু! পুংগগুলোকে কখখনো খাষামোদ করিস্নে!...তেল দিলেই ওদের লেজ মোটা হয়ে

যায়!...ওদের যতো দাবিয়ে রাখবি,—ততো আখেরে ভাল হবে! পাথর ভাঙ্গতে হয় মুগুর দিয়ে,—জল দিয়ে নয়।

প্রমোদ। কিন্তু দোষটা আমারই!...ওর গানখানা শুনে আমি যদি ঐ মন্তব্যটা না কর্ত্তুম,—তা'হ'লে বোধ হয়, রেগে উঠে যেতো না!

বক। তুমি ঠিক কথাই বলেছো! শ্যালীকে শোনাতে এলেন হনুমানের গান। কেন? সঙ্গীতশাস্ত্রে কি আর গান ছিল না?

প্রমোদ। তবু, কি জান, নতুন ভায়রা-ভাই! আমার একটু সংযত হয়ে থাকা উচিত ছিল!...যা হোক্, অরু? তুমি ভাই কিছু মনে কোরো না। আমি সত্যি বলচি,—ওঁকে অপমান কর্ব্বার জন্যে আমি কিছু বলিনি।

অরু। দাদাবাবু? আমার অনেক সহ্য আছে। উনি ভূগোলে-পড়া আগ্নেয়গিরির মত! আগুন সর্ব্বদাই বেরুচ্ছে!... তুমি কিছু ভেবো না!

বক। যাক্‌গে!...রেগে গিয়ে থাকে, ঘরের ভাত বেশী করে খাবে।...

গীত

তোমরা যদি বুঝতে, (ওগো) তোমরা যদি জানতে,
তা'হ'লে কি কাঁকর-পথে জীবনের রথ টানতে?
তোমরা রজ্জুতে দেখো সাপ,
রেশমী সুতোয় দাও যে বেজায় চাপ,
না হ'লে কি খাল কেটে, ঘরে কুমীর আনতে?

অন্ধকারে গাছকে দেখো ভূত,
খোঁপার তলায় প্রেমের চিঠি দেখো যে প্রভূত,
আকাশেতে লাঙ্গল চালাও, ঝগড়ার বীজ বুন্‌তে।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান :—জগবন্ধু বাবুর বাটী। অলিন্দ।

সমীরের প্রবেশ।

সমী। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাসের আঁটি! ঘোড়া তা'তে
ট্ মার্কে বৈ কি!...কিন্তু কি ক'রে চোরাকারবারটার ভেতরে
াঁদ কাটি! ...হুঁ! হয়েছে! বুদ্ধি থাকলে মানুষের কাজ হ'তে
'তে কতক্ষণ লাগে!...কিন্তু একটু কাগজ কলম দরকার!
কোথায় পাই!...পাশের ঘরেই পাবো বোধ হয়!

(প্রস্থানোদ্যোগ)

পরীক্ষিতের প্রবেশ।

পরী। জামাই বাবু? জামাই বাবু? মা আপনাকে
ডাকচেন, জল-খাবার খেতে!

সমী। যা যাঃ বেটা এখান থেকে! গোড়া কেটে
আগায় জল!

(প্রস্থান)

পরী। বাবা! জল-খাবারেতে রাগ!...তা, এইতো
একপেট সেঁটেছেন! একসের মাংস একাই মেরে দিলেন। ..
এই সব (নিজের দিকে দেখাইয়া) তীর্থির কাকগুলোর জন্যে
একটুকরো পড়ে নেই!...আর কতো গিলবেন?

…আহাহা! মুরগীর মাংস খেতে কি চমৎকার!

গীত

কোঁকোর কোঁ কোকোর কোঁ,—মরি কিবে ডাক!
ভোর বেলাতে বাজায় যেন লক্ষ্মী-পূজোর শাঁখ!
মাংস কেমন নরম তুল-তুল,
মুখে দিলে রাবড়ি ব'লে হয় যে ভুল,
(আবার) কুঁচকি-কণ্ঠা খেলে পরেও হয়ে যায় পরিপাক!
চাট্‌গাঁ মোরগ, মোরগ-রাজা, হলো জাত-ছাড়া,
মেনি-মুখো বাঙালীদের কপাল যে পোড়া,
এবার বাবুরা সব খাবেন কি?
শুধু কাঁচকলা আর কলমি-শাক!
(ওরে) এমন মোরগ না জুটলে, মরবে বাবু লাখে-লাখ!
(গান গাহিতে গাহিতে প্রস্থান)।

পঞ্চম দৃশ্য

জগবন্ধু বাবুর বাটী। পার্শ্বের গৃহ।

সমীরের প্রবেশ।

সমীর। এইযে এঘরে টেবিলের ওপর দোয়াত-কলম কাগজ রয়েছে।…তা হ'লে এখনই চিঠি-খানা লিখে ফেলি!

[সমীর টেবিলের সম্মুখে বসিয়া চিঠি লিখিতে আরম্ভ করিল। পাশের ঘরে বরুণা তখন গান গাহিতেছে]।

নেপথ্যে গীত

চাঁদের দেখা পেতে হ'লে, উপর-পানে চাইতে হয়!
আকাশ-রাণী ধরার পাঁকে নেমে কবে হয় উদয়?
অলি আসে, কুসুম পাশে, রূপের পিয়াসে,
মাণিক রহে মাটির তলে আঁধার-নিবাসে,
যার গরজ আছে, সেইতো খোঁজে, তারই শেষে জয়!
ওরে রূপের পাখী? দিস্‌নেরে ধরা,
বে-রসিকে খুলেছে কারা।
সেখানে তোর অপমানের হবে অভিনয়।

নীর। দেখি কি লিখলুম! (পাঠ)

"প্রিয়তমে,—ডিয়ার অরু,

বুকের হাড় ভেঙ্গে দিয়েও, এখনও কি তুমি দেখতে পাচ্ছনা, সেখানে যে প্রাণটা আছে,—সেটা তোমার মতো সুগন্ধি-ফুলে ভ্রমর হয়ে বসবার জন্যে ছট্‌ফট্ কচ্ছে! তোমাকে আর কত কোরে ভ্রমর বোঝাবে যে সে তোমার জন্যে পাগল! তুমি কি রোজ আমার হাব-ভাব দেখে বুঝতে পারোনা?

আজ রাত্রে তোমাকে না পেলে, আমি হয় পাগল হবে যাবো,—না-হয় গলায় দড়ি দিয়ে প্রেমিকের ইতিহাসে রক্তাক্ষরে নাম লিখে যাবো! সুন্দরি অরু? আজ রাত্রে ঠিক এগারোটা বাজলে, তোমাদের বাড়ীর তেতালার ছাদে লুকিয়ে এসো;—আমি সেখেনে লুকিয়ে থাকবো,—যেমন শ্রীকৃষ্ণ থাকতেন কদমগাছে লুকিয়ে গোপিনীদের কাপড় চুরি ক'রে! তারপর তুমি এলে,—ও হো হো! প্রাণের অরু? তোমার

অধরের স্বর্গীয় সুধাটুকুর জন্যে এই অধম পিয়াসী চাতকের মতো চেয়ে রইলো।

নিশ্চয়—নিশ্চয় এসো। এ প্রেমের ভিখারীকে প্রেমের বদলে হত্যা কোরো না! ইতি—

তোমার রূপের অতিথি

তোমার দাদাবাবু।

হুঁ, হুঁ,—এবার একঢিলে দুই পাখী! চিঠিখানা এই টেবিলে রেখে দি!···অরুণাতো এখনই এঘরে আসবে,—এলেই তার চোখে পড়বে!···তারপর?···তাহলেই ঐ বুনো শূয়োর আর মেদী শেয়াল পড়বে এই সমীর চন্দ্রের জালে!

(টেবিলে চিঠিখানি রাখিয়া, পা টিপিয়া টিপিয়া প্রস্থান)।

একটু পরেই প্রবেশ করিল অরুণা।

অরু। উঃ! আমার কাঁদতে ইচ্ছে কচ্ছে! এখানে শ্বশুর বাড়িতে এসেও সেই রাগারাগি, অভিমান, একগুঁয়েমি!··· আমার আর বেঁচে সুখ কি?···দেখি, কোথায় আবার চটকে গেলেন!···একটা পান মুখে দিয়ে যাই টেবিল থেকে! (টেবিল হইতে পান লইতে গিয়া, পানের ডিবার তলায় একখানি চিঠি দেখিতে পাইয়া) একি? আমার নামে চিঠি? (চিঠিখানি পড়িয়া) একি! দাদাবাবু আমাকে এমন চিঠি লিখতে পারে? দাদাবাবু!···না, না, এ কখনই সম্ভব নয়!··· দিদিকে দেখাই! দিদিই ঠিক ব'লে দিতে পার্ব্বে, কোথা থেকে কি হলো! (উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া) দিদি? দিদি?

(বরুণার প্রবেশ)

অরু এই চিঠিখানা পড়ো ত দিদি!

বরু। দেখি! (চিঠি লইয়া পাঠ) একি! তোর দাদাবাবু
কে এইসব লিখেছে! দাঁড়াতো, ওঘরে গিয়ে ওর ঘাড়
কে আসি!...তার মনে এইসব আছে!

(প্রস্থানোদ্যোগ)

অরু। (বরুণার হাত চাপিয়া ধরিয়া) দাঁড়াও!...আগে
দেখো, সত্যি এটা ওঁর লেখা কিনা!

বরু। (পুনরায় চিঠির দিকে তাকাইয়া) নাঃ! এতো ওর
তর লেখা নয়!...এ আর কারুর লেখা!

অরু। তবে?...আমার কিন্তু দেখে মনে হচ্চে, এ লেখা
ারই গুণধরের!

বরু। ঠিক চিনতে পাচ্চিস্ তুই?...তাই হবে! তোর
তোর দাদাবাবুর গায়ে একটা নোংরা কাদা ছুঁড়ে মারবার
লোকটা একটা বদ্ মতলব এটেছে!...হুঁ, তাই সম্ভব!
াচ্ছা, দাঁড়া, একটা মজা কচ্চি, তাহ'লেই ঠিক ধরা
ব!

অরু। কি মজা?

বরু। সে তোকে এখন বলবোনা। রাত্রি এগারোটে
টের পাবি!

অরু। দোহাই দিদি! দেখো যেন একটা কাণ্ড না ঘটে
লোকটা বড় বদ্-রাগী!

বরু। কিছু ভয় নেই, আমি তার জন্যে দায়ী। রাগীর
আবার ঘাগী আছে! (উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া) পরীক্ষিৎ?
ীক্ষিৎ?

(পরীক্ষিতের প্রবেশ)

পরী। আজ্ঞে?

বরু। হাঁরে, তুই কাল বলছিলিনা যে, তুই মোটেই ভূতের ভয় পাসনে?

পরী। ভূত? সেটা আবার কোন্ সুমুন্দি?

বরু। ভূত,—ভূত!...ভয় পা'সনে তো? ঠিক বলছিস্?

পরী। না, মোটে না!.. তোমাদের না বিশ্বাস হয়, পরখ করো।

বরু। রাত দু'টোর সময় শ্মশানে তুই একা যেতে পারিস?

পরী। (বুক চাপড়াইয়া) ও! আলবৎ! ফেলো বাজি একসের সন্দেশ!...আমি অমাবস্যের রাত্তিরে...কালাদীঘির শ্মশানে একা গিয়ে ভাঁটা খেলে এসেছি।

বরু। অমাবস্যে কবে?

পরী। পাঁজি দেখো। আর পাঁজি না থাকে, মঙ্গলা ঝিকে জিজ্ঞাসা করো,—ওর বাত চাগাতে ক'দিন আর দেরী আছে! সেইদিন জানবে ঠিক অমাবস্যে! পাঁজির ভুল হবে, কিন্তু ওর হাঁটুর কখনো ভুল হবে না।... হুঁ!

বরু। তবেই হয়েছে! সে এখন কতো দেরী, ঠিক নেই!...আমরা কি অতোদিন বাপের বাড়ীতে থাকবো?...তার চেয়ে এক কাজ কর্।

পরী। বলো।

বরু। তোকে একসের সন্দেশ খাওয়াবো, আজ রাত এগারোটার সময় আমাদের তেতলার ছাদে তুই যদি বেড়িয়ে

াসতে পারিস্ !...কালাদীঘির শ্মশানে ত আমরা মেয়েমানুষ
দখতে যেতে পারবো না, তুই সত্যি-সত্যি ভাঁটা খেলে
লি কিনা !

পরী। কেন, একটা মড়ার মাথা এনে তোমাদের
দখাবো !

বরু। ওরে বাবা ! না, না, সে সব কাজ নেই।...আজ
মাদের বাড়ীর তেতলার ছাদে ঘুরে এসে তুই দেখা যে,
ত তোর কিছুই কর্ত্তে পারে না !

পরী। এই কথা ? 'এ আর বেশী কি ? হা-হা-হা ! (হাস্য)

বরু। একসের সন্দেশ কেন ? দু'সের দেবো !...আর
টা সাহসের কাজ কর্ত্তে পারিস তো, পাঁচসের দেবো !
গাম টাকা !

পরী। (লাফাইয়া) নিশ্চয় পার্ব্বো। বলো, কি কর্ত্তে
ব ? বেলগাছের বেহ্মদত্তিকে ধরে আনতে হবে,—না
-ভাগাড়ের শাঁখ-চিরুণিটার নাক-কান কেটে আনবো ?

অরু। দিদি ? ওর কথা শুনে আমার মাথাটা কেমন
চ্ছে ! আমি শুইগে !

(প্রস্থান)

বরু। (পরীক্ষিতের প্রতি) না, সে সব কিছু নয় !
কে,—মেয়েমানুষ সেজে,—তেতলার ছাদে রাত্তিরে একা
ড়য়ে বেড়াতে হবে !

পরী। ও বুঝেচি। দিদিমণি আমার সব জানে ! ভূতেরা
মানুষ দেখলেই বেশী ঘাড়ে চাপে কিনা,—সেইজন্যে তুমি

বলচো, বউ সেজে গেলেই আমাকে ভুতে ধরবে। বেশ, তাই হবে।

বরু। তুই ঠিক ধরেছিস্! মাথায় কাপড় দেওয়া বউ সেজে তুই যদি তেতলার ছাদে ঘুরে বেড়িয়ে আসতে পারিস, ...কিন্তু একটা কথা হচ্ছে, তুই কি মেয়েমানুষ সাজতে পার্বি?

পরী। ওঃ! খুব পার্ব্বো!...আমি যে তোমাদের বাড়ীতে চাকরি কর্ব্বার আগে যাত্রার দলে ছিলুম, তা বুঝি জানো না?

বরু। তাই নাকি? কি সাজতিস্?

পরী। ওঃ! সাজতুম একেবারে নায়িকা! আমার চেহারা দেখে, পেরথমেই আমায় সাজবার পার্ট দিয়েছিল...দয়মন্তী।

বরু। দয়মন্তী আবার কে?

পরী। দয়মন্তী, দয়মন্তী! নল-রাজার বউগো! ভিঁদুর রাজার মেয়ে হয়ে তা জানোনা?

বরু। বলিস কি? এতবড়ো পার্ট করেছিলি? কই, একটু অ্যাক্টিং করে দেখা দেখি।

পরী। কর্ব্বো? শুনবে?—

(তাড়াতাড়ি কাপড়ের কোঁচা খুলিয়া মাথার উপর ছড়াইয়া দিয়া, যাত্রার সুরে ও কৃত্রিম রমণী-কণ্ঠে)।

"মহারাজ?

যাইলাম সরোবরে সুত মস্ত (১) লয়ে,

ধৈত (২) করি' আনিব বলিয়া!

(১) মস্ত=মৎস্য (২) ধৈত=ধৌত

হেনকালে মরামাছ পেরাণ পাইয়া
পলালো সলিলে!
একি হ'লো প্রাণেশ্বর?

(পুরুষের মোটাগলা ধরিয়া ও মাথার কাপড় নামাইয়া লইয়া)

তখন মহারাজ নল বললেন :—

প্রাঁড়েশ্বরি?
বুঝিয়াছি এ সকল কলির কৌশল! (১)
তা না হ'লে মৃত (২) যাহা, তাহা কভু
পায় কি জীবন?

বরু। (কষ্টে হাঁসি চাপিয়া রাখিয়া) চুপ, চুপ অতো মোটা গলায় কথা কস্‌নে। এখনি বাবার কাণে যাবে, আর সব গোলমাল হয়ে যাবে।

পরী। (কণ্ঠ নামাইয়া) আচ্ছা, আর একদিন তোমাকে সব অ্যাক্‌টিনিটা শুনিয়ে দেবো!

বরু। আর কি কি মেয়েমানুষের পার্ট প্লে করেছিস্‌?

পরী। ওঃ! অনেক, অনেক দময়ন্তী, সীতে, শকুন্তলা, এই সব কতো কি!

বরু। তবে তুই পার্বি!...আচ্ছা, তাহ'লে এই কথা রইলো, আজ রাত এগারোটার একটু আগে তুই মেয়েমানুষ সেজে এসে, আমার সঙ্গে দেখা করে, তারপর তেতলার ছাদটা বেড়িয়ে আসবি! কেমন?...আচ্ছা, যদি না পারিস্‌ কি ভূত যদি তোর গলা টিপে মেরে ফেলে, তাহ'লে কিন্তু উল্‌টে আমাকে সন্দেশ খাওয়াতে হবে!

পরী। আচ্ছা বেশ। এই কথা রইলো।

বক্রু। এইনে আগাম পাঁচ-টাকা!

পরী। ও টাকা তোমরা রাখো। একেবারে এক হাঁড়ি। ...এই চললাম সাজ-গোজ সব যোগাড় কর্তে।

(প্রস্থানোদ্যোগ)

বক্রু। সাজ-গোজ আবার কোথায় যোগাড় কর্বি?...

পরী। এই কাছেই এক যাত্রার দল আছে, সেখান থেকে গিল্‌টি-করা কিছু গয়না, আর একখানা চটকদার সাড়ি ভাড়া ক'রে আনবো।

বক্রু। না, না, সে সব করিসনে!...জানাজানি হয়ে যাবে! তা'হ'লে ভূতগুলো হুঁসিয়ার হয়ে যাবে।

পরী। তবে কি ক'রে মেয়েমানুষ সাজবো?

বক্রু। দাঁড়া, আমি একখানা চটক্‌দার সাড়ি এনে দিচ্ছি, তোর ছোড়্‌দিদিমণির কাছ থেকে চেয়ে। সেইখানা পরলেই বেশ মেয়েমানুষ মানাবে। অলঙ্কার-পত্র প'রে দরকার নেই! ও গুলো সব সোনায় তৈরি কিনা, তাই ভূতে ছুঁতে চায়না, বুঝলি?

পরী। (অসন্তুষ্ট ভাবে) আচ্ছা, তবে তাই। কৈ, তা হ'লে এনে দাও ছোড়্‌দিদিমণির একখানা সাড়ি! বেশ জ্বলজ্বলে পাড় হয় যেন!

বক্রু। হাঁ, হাঁ, তাই হবে!

(প্রস্থান)

পরী। আমি আসচি তাহ'লে দাড়ি-গোঁপটা কামিয়ে; আর একটা পরচুলো ভাড়া ক'রে আনি!

(প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

কাল :—রাত্রি। এগারোটা বাজিতে পাঁচমিনিট বাকি।

স্থান :—বারাণ্ডা।

বরুণা ও অরুণার প্রবেশ।

অরু। দিদি? তোমার ভগ্নীপোত বোধ হয় বাড়ী চ'লে গেল! খাওয়া-দাওয়া ক'রে কোথায় যে ডুব মারলো, তার সন্ধান পাচ্চিনে!

বরু। বেড়াল গেছে শিকারের চেষ্টায়।···খল হ'লে মানুষ সোজাপথ ভুলে যায়।

অরু। তুমি বলছো, সে তেতলার ছাদে গিয়ে লুকিয়ে আছে?

বরু। হাঁ, হাঁ,—তুই যেই যাবি তোর দাদাবাবুর সঙ্গে প্রেম কত্তে, অমনি লুকোনো জায়গা থেকে গাঁক্ ক'রে তোকে ধরবে। তোর ওপর সন্দেহ হওয়াতে, ও এখন বাঘের মত হিংসুকে হয়ে উঠেছে।···তুই যা, ঘরে গিয়ে গ্যাঁট্ হয়ে শুয়ে থাকগে যা! খানিক পরেই জানতে পাবি, সে কোথায় ছিল।

[নারীবেশে পরীক্ষিতের প্রবেশ]

বরু। কেগা তুমি বাছা? এতরাত্রে ভদ্রলোকের বাড়ীর ওপরে একেবারে উঠে এলে?

পরী। আমি পরীগো পরী। আকাশ থেকে উড়ে এলুম। এবার আবার তোমাদের তেতলার ছাদে উড়ে যাবো।...

(যাত্রার সুরে)

আমি দ্রৌপদী! আসিয়াছি
কীচকে ভেটিতে!
বড় ভালবাসি তারে!

বরু। (চিনিতে পারিয়া) তুই? পরীক্ষিৎ? বাবা! এমন মেয়েমানুষ সেজেছিস যে আমি অবধি প্রথমে চিনতে পারিনি! আমি বলি, কে না কে এলো।

পরী। (যাত্রার সুরে)

লো পাঞ্চালি? দেহ অনুমতি,
যায় ব্রকোদর (১) এবে কীচক-নিধনে!

(সাধারণ কণ্ঠে) আমি যে যাত্রায় একবার ভীম সেজেছিলুম! তাতে দ্রৌপদী সেজে, কীচকের কাছে গিয়ে,—(লজ্জার অভিনয়ে মুখে অঞ্চল ঢাকা দিয়া) তোমার সুমুখে বলতে নজ্জা করে দিদিমণি—হি,-হি,—পেরেম কর্তে গিয়েছিলুম।

বরু। (হাঁসিয়া) এতো রকমও জানিস তুই বাপু! বেটা যেন বহুরূপী!...মেয়েমানুষের চুল কোথায় যোগাড় করলি?

পরী। যাত্রার দলের আকড়া থেকে এই পরচুলোটা ভাড়া করে আনলুম।...দু'টাকা ভাড়া নিলে। তোমায় দিতে হবে, দিদিমণি।

(১) ব্রকোদর=বৃকোদর।

বরু। আচ্ছা, দেবো।

পরী। (যাত্রার সুরে) তবে দেও অনুমতি !

যাই এবে সকাজ্জ সাধনে।

বরু। নে ঢঙ্ রাখ্! আস্তে আস্তে ওপরে যা! দেখিস্ যন ভূতে তোকে উড়িয়ে না নিয়ে যায়! যা সাজন সেজেছিস্!

পরী। আমি পরী! আমি ত নিজেই উড়তে পারি! আমাকে আবার ওড়াবে কে? (আস্তে আস্তে তেতলার সঁড়ি আরোহণ)

অরু। কি জানি দিদি? ভয়ে আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। য গোঁয়ার মানুষ তোমার ভগ্নীপোত। একটা কাণ্ড না ঘটে যায়।

বরু। কাণ্ড তো ওই বাঁধালে!...দেখ্, কান পেতে থাকিস্! দরকার হ'লে তাড়াতাড়ি ছাদে যেতে হবে!

সপ্তম দৃশ্য

স্থান:—তেতলার ছাদ। সময়-রাত্রি এগারোটা। অল্প মেঘাবৃত আকাশ। মেঘ ভেদ করিয়া সপ্তমীর আলোক-দরিদ্র অস্পষ্ট জ্যোৎস্না ছাদে পড়িয়াছে। সে আলোকে মানুষ দেখা যায়, কিন্তু চেনা যায় না। ছাদের উপর একাকী এককোণে লুকাইয়া বসিয়া সমীর।

সমী। আসবার সময় উঁকি মেরে দেখে এলাম, শ্রীমতী মারসির সুমুখে দাঁড়িয়ে কতো ঢং ক'রে চুল চিঁচড়ুচ্ছেন! ততক্ষণে বোধ হয় রস-খোঁপা বাঁধা হলো!...এবারে,—মুখে

পাউডার মেখে, কপালে টিপ্‌টি কেটে, হেলতে-দুলতে আসবেন গুপ্ত-বৃন্দাবনে!...কিন্তু এদিকে যে গুপ্ত-বৃন্দাবনের বদলে আছোলা বাঁশ,—তাতো জানেন না বাছাধনী!... জানবেন এখুনি!...এখনও আসচে না কেন? এ কাজেতো শ্রীমতীরা কখনও কুড়েমি করেন না!

(নেপথ্যে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ)

ঐ যে পায়ের শব্দ শোনা যাচ্চে!...এইবার! এইবার শূর্পণখার নাক-কাণ কাটা!

[নারী-বেশে পরীক্ষিতের প্রবেশ। আঁধার-আলোকে সমীর তাহাকে অরুণা বলিয়াই ধরিয়া লইল]।

সমী। (স্বগতঃ) ছঁ! নিশ্চয়ই সে! হাঁ, ঐ যে,—যে বড়দার সাড়ীখানা আমি সখ ক'রে, সারা বড়োবাজার ঘুরে ঘুরে ওকে কিনে এনে দিয়েছিনু, সেই কাপড় খানা পরেই সতীত্ব করতে আসচেন! (লুকানো জায়গা হইতে পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া একেবারে পরীক্ষিতের ঘাড়ের উপর পড়িয়া তাহাকে প্রহার)। তবে রে শালী সয়তানী! ভ পোতের সঙ্গে গুপ্ত-প্রেম কর্ত্তে আসা হচ্চে! হতভাগী!

[কিন্তু পরীক্ষিতের গায়ে জোর বেশী। সে আক্রান্ত হইতেই 'ব্রহ্মদৈত্য' বা 'ভূত' ভাবিয়া সমীরকে এক ঝাপ্‌টা দিয়া ফেলিয়া দিল ও প্রহার আরম্ভ করিল]।

পরী। তবে রে শালা বেহ্মদত্তি! মেয়েমানুষ দেখে

ভারি লোভ হয়ে গেল ! না ? (সমীরকে ঘুঁষি মারিয়া) কেমন আরাম হলো প্রাণেশ্বর ? (সমীরের গণ্ডে দংশন করিয়া) আহাহা ! একটু চুমু দাও, ভাই !

সমী। ওরে বাবারে ! মলুমরে, গেলুমরে !...কে তুই ? ...কে তুই ?

পরী। কেন ? তোমার ভালবাসার পেয়ারী ! (ঘুঁষি মারিয়া) দেখচো না, কেমন লোহার মত শক্ত হাত ! কেমন খোঁচা-খোঁচা দাড়ি-ওয়ালা গাল ! আর একটা চুমু খাবো, প্রাণেশ্বর ?

সমী। পরীক্ষিৎ ? তুই পরীক্ষিৎ ? ছেড়ে দে বাবা, ছেড়েদে ! আমি জামাই-বাবু !

পরী। মারের চোটে অনেক শালা ভুত জামাই-বাবু হয় ! তুই বেল্লাদত্তি !...তোকে আজ বাড়ী ছাড়া কর্বো, তবে আমার কাজ। (বগল হইতে একটি ছোট লাঠি বাহির করিয়া) দেখচিস্ লাঠি ? আর জামাই-বাবু সাজবি ? (লাঠি উঁচাইয়া)

সমী। ওরে বাবা ! লাঠির বাড়ি মারিসনে ! মরে যাবো ! মরে যাবো ! পরীক্ষিৎ ! আমি-আমি-জামাই-বাবু !

পরী। মারবো না ? শালা ! (এক ঘা লাঠি পিঠে মারিল)

সমী। ওরে বাবারে ! মলুমরে !...(চেঁচাইয়া) কে কোথায় আছ ? আমায় বাঁচাও !

পরী। কে আবার থাকবে কোথায় ? আমিই আছি তোমার প্রেয়সী !...আর এক ঘা দেবো ? হুঁ, হুঁ,—বাবা ! পাঁচসের সন্দেশ পাবো, পাঁচসের ! (পুনরায় প্রহার)

সমী। (উচ্চৈঃস্বরে ও কাতর-কণ্ঠে) দিদি? দিদি? অরুণা?

(অরুণা ও বরুণার দ্রুতবেগে প্রবেশ)

বরু। কি করিস্, কি করিস্ পরীক্ষিৎ? উনি যে জামাইবাবু, মারিস্‌নে, মারিস্‌নে অমন ক'রে!

পরী। জামাইবাবু আবার কোথায় দেখচো দিদিমণি? ও একবেটা বেহ্মদত্তি! ছল ক'রে জামাইবাবুর চেহারা ধরেচে! (সমীরের কাণ ধরিয়া) কি জামাইবাবু? বেলগাছে আপনি আপনি যাবি, না ছুঁড়ে ফেলে দেবো?

সমী। ওগো বাবা, মলুমরে! কাণ ছিঁড়ে গেলরে!... দিদি? দিদি? অরুণা? আমাকে বাঁচাও! আমাকে এর হাত থেকে উদ্ধার করো!

বরু। পরীক্ষিৎ? শীঘ্র ছেড়ে দে বলচি। নইলে এখুনি বাবাকে ডাকবো!

পরী। দিদিমণি? ওকে ছেড়ে দিলে, এখনই তোমাদের উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে বেলগাছের ডালে ফেলবে! (পুনরায় কাণ ধরিয়া) বেলগাছে যাবি?

সমী। নারে বাবা, যাবোনা, যাবোনা! পরীক্ষিৎ, তোর পায়ে ধরচি, ছেড়েদে!

পরী। নাকে খত দে দিদিমণিদের কাছে! বল, আর কখনো জামাইবাবু হবিনে! তবে তো ছাড়বো!...দিদিমণি, কই দাও পাঁচসের সন্দেশ!

বরু। (রুষ্টভাবে) পরীক্ষিৎ! ছেড়েদে বল্‌চি।...নইলে,

বাবাকে ডাকলুম ! (উচ্চৈঃস্বরে) বাবা ? বাবা ? শীগ্‌গির একবার ছাদে এসো !

পরী। সে কি ? বাবুকে ডাকচো ? তা'হলে পালাই ! তোমরা বুঝি সড়্ করেছো, আমাকে মারবে বলে ? পালাই এই বেলা !

(দৌড়িয়া প্রস্থান)

বঙ্ক। (সমীরের গায়ে হাত বুলাইয়া) বড্ড লেগেছে সমীর ?

সমী। উঃ ! বেটা একেবারে হাড়-গোড় ভেঙ্গে দিয়েছে ! ...ও বেটা তেতলার ছাদে কেন এলো, রাত এগারোটার সময় ?

([illegible] দৌড়িয়া প্রবেশ)

জগ। কি হয়েছে ? কি হয়েছে ? এখানে এতো গোল-মাল কিসের ?

বঙ্ক। জামাই-বাবু ছাতে বেড়াতে বেড়াতে, হঠাৎ ভূতের ভয় পেয়ে একেবারে গোঁ গোঁ কচ্ছিলেন।...ভয় নেই, এখন জ্ঞান হয়েছে।

জগ। ডাক্তার ডাকি ? ডাক্তার ডাকি ?

সমী। আজ্ঞে না, ডাক্তার দরকার হবে না। দিদিই আমাকে সারিয়ে দিয়েছেন।

বঙ্ক। তুমি যাও বাবা, শোওগে যাও, আমরা ওঁকে প্রকৃতস্থ কচ্ছি।

জগ। যাবো ? কোন প্রাণের ভয় নেই তো ?

বরু। না। সামলে গেছেন।

জগ। আঃ! বাঁচালি।...আচ্ছা, আমি যাই।

(প্রস্থান)

বরু। কি হয়েছিল সমীর?

সমী। দিদি? অরুণা? তোমরা আমায় মাপ করো। এই নাকে খত দিচ্ছি! পরীক্ষিৎ বেটা কেন যে মেয়েমানুষ সেজে তেতলার ছাদে এসেছিল, তা বেশ বুঝতে পাচ্ছি।... আর কখনও অকারণে ওয়াইফের ওপর সন্দেহ কর্ব্বো না।... যে অকারণে সন্দেহ ক'রে নিরপরাধ পত্নীকে লাঞ্ছনা দেয়, তার মতো আহাম্মক আর নেই!...সে রোগের ওষুধ আমার মতো এই লাঠৌষধি।

"আমায় উদ্ধার কর্ত্তে পারো ?"

(গল্প)

—(:*:)—

(১)

"তুই ভূত বিশ্বাস করিস্ নে ?"

"মোটেই না।"

"বিশ্বাস করিস্ নে ?"

"মোটেই না।"

"কিন্তু আমি বিশ্বাস করি।"

"তুই হয়তো কর্ত্তে পারিস্। কেননা তুই একটা চক্ষুষ্মান্ অন্ধ লোক। আমি তোদের মত অন্ধও নই,—অজবুকও নই।"

"আমি যা স্বচক্ষে দেখেছি, তা অবিশ্বাস কর্ত্তে পারি না।"

"কি তুই স্বচক্ষে দেখেছিস্ ?"

"তবে শোন্। আমি গেল বছর গিয়েছিলম মামার বাড়ীতে। এখান থেকে তিন ক্রোশ দূরে ভৈরবপুর ব'লে যে গ্রামখানা আছে, সেই গ্রামে। সেখানে আমি নিজ চক্ষে ভূত দেখেচি।"

"কি রকম, কি রকম ?" বিধুভূষণ সরিয়া আসিয়া নিখিলের কাছ ঘেঁষিয়া বসিল। নিখিল বলিয়া যাইতে লাগিল :—

একদিন রাত্রে, খাওয়া দাওয়ার পর আমি আমার নির্দ্দিষ্ট ঘরে শুতে গেলুম। পাড়াগাঁ জায়গা, সেখানে এত হ্যারিকেন আলোর ছড়াছড়ি নেই। ঘরে একটা মাটির পিদ্দিপ্ মিট্ মিট্ ক'রে অন্ধকারের ভেতর চৌকি বিছানার অস্তিত্ব জানাচ্ছিল। একদিকের একটা জানলা খুলে দিলুম, হাওয়ার একটু আশীর্ব্বাদ পা'ব ব'লে। বাইরে বাঁশগাছের ঝোপ, তাতে ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকচে, একটা মরা-কান্নার মত সুরে। তা'হ'ক, তাতে ভয় পেলুম না, শুয়ে পড়লুম একখানা চাদর গায়ে দিয়ে, পাড়াগাঁয়ের সেই ময়লা বিছানার ওপর। পিদিপ্‌টা নেবালুম না,—অনভ্যস্ত যায়গায় পাছে ঘুমের ব্যাঘাত হয় ব'লে। একটুখানি শুয়েচি, এমন সময় মনে হ'ল, জানলার ওপর কিসের যেন ছায়া পড়লো।"

অজয় গম্ভীর ভাবে বলিল, 'তার পর?" তার কথার সুরে একটু উপহাসের রসিকতা মিশানো ছিল।

বিধুভূষণ কোনও কথা কহিল না, সে শুধু গল্প শুনিতে লাগিল।

তিনজনেই একবয়সী এবং বন্ধু। গঙ্গার ঘাটে বসিয়া হাওয়া খাইতে ছিল। অষ্টমীর চাঁদ পশ্চিম আকাশের কোণে চলিয়া পড়িয়া, শুধু টু দিতেছিল। রাত্রি কিছু হইয়াছিল, ঘাটে আর জনমানব কেহ ছিল না।

নিখিল আবার বলিতে আরম্ভ করিল: "আমি প্রথমে চোখ বুজিয়েছিলুম, কিন্তু কেন যে চোখটা আপনি আপনি খুলে গেল, তা বলতে পারিনে। যা'হ'ক, জানলায় একটা

ায়া পড়তে দেখে মনটা কেমন চঞ্চল হ'ল। ভাবলুম, চোর
াকি? লাঠিটার কথা মনে হ'ল। লাঠিটা ঘরের এককোণে
াখেছিলুম, এটা বেশ স্মরণে ছিল। উঠলুম ঠেলে-মেলে
াঠিটার জন্যে। আস্তে আস্তে উঠে, লাঠিটা হাতে বাগিয়ে,
াঘমন্দ্রস্বরে হুঙ্কার দিয়ে খোঁজ নিলুম, "কেও?" কেউ
ত্তর দিলে না। যে ছায়াটা পড়েছিল, সেটাও সট্ ক'রে
াথায় সরে গেল। তখন ঠিক করলুম, নিশ্চয়ই একটা চোর
সেছিল।

"যাহ'ক, জানলার লোহার গরাদেগুলো বেশ মোটা মোটা
াছে কিনা পরখ্ ক'রে নিয়ে, আবার শুয়ে পড়লুম। অবশ্য
ঠিটাকেই করে রাখলুম পাশ-বালিশ। ঘুম আর আসে না;
মন অজানা জায়গা, তার ওপরে বাড়ীর চারিধারে আর
ানও মানুষের বাস নেই। মামা লোকটা নেহাৎ সেকেলে;
কটা জঙ্গলের ভেতর গিয়ে বাস করছে। জমি-জমা কিছু
াছে; তার লোভটা ছাড়তে পারে না আর কি! এই
ঙ্গলের ভেতর তারা দুটি মনিষ্যি থাকে। মামা আর মামী;
ার তাদের কেউ নেই!"

অজয় জিজ্ঞাসা করিল: ছেলে পুলে নেই?

নিখিল বলিল: না! এইত সবে দু-বছর মাত্র বিয়ে
য়েছে! মামা তো চিরকালই গাঁজা খেয়ে ব্যোমকালি হয়ে
ড়াতো! 'আ'কারান্ত কি 'ঈ'কারান্ত মানুষের বড় ধার
রতো না। একটা ছোট কল্‌কে আর খানিকটা 'বৈরাগ্য'
পলেই তার দিন কেটে যেতো। বিয়েতো জোটেই না! কে

তার মেয়েকে ঐ চিতার আগুনের ওপর জ্যান্তো ঠেলে ফেলে দেবে? শেষে,—

অজয় বাধা দিয়া বলিল: "যাক্! তোর ভূত দেখার কি হোল?"

"আরে সবটা আমাকে বলতে দে! আতপুরের যোগীন চাটুয্যেকে চিনিস্?"

"চিনি বৈ কি! সেও তো আর এক স্থল-জল-ব্যোম।"

"হাঁ, তিনিও দিনরাত্তির মহাদেব সেজে বসে আছেন। তাঁর এক মেয়ে ছিল, অপরূপ সুন্দরী! পাথরের ওপর মল্লিকা ফুল ফুটলে যেমন দেখতে হয়, ঠিক তেমনি। সেই মেয়েকে জোর ক'রে ঝুলিয়ে দিলে আমার মামার গলায়। বেটা গেঁজাখোর মেয়ের দিকে একবার তাকালে না, বিয়ে দিলে ঐ মড়াটার সঙ্গে।

"যাক্, আর রাত্রিবেলায় গুরু-নিন্দাটা করিস্ নে! তুই যে ভূতের গল্প করছিলি, তাই কর্।"

'হাঁ, যে কথা বলছিলুম। ঘুমতো ভাই কিছুতেই হয় না! শেষে ভাবলুম, আলোটা নিবিয়ে দি। কিন্তু যেমনি বিছানা থেকে উঠেছি,—অমনি দেখি জানলাতে আবার সেই ছায়া। এবারে আর ছায়া নয়, একেবারে সত্যিকারের তিনি। মাথায় এতখানি এক-ঘোমটা, হাতে দুগাছা শাঁখা আর পরণে এক লাল টুক্‌টুকে শাড়ি! তাই না দেখে, আমার ত ভাই একেবারে দাঁতকপাটি! কতক্ষণ যে মাটিতে মুখ গুঁজড়ে পড়েছিলুম, মনে নেই! যখন জ্ঞান হ'ল, তখন দেখি ঘর একেবারে অন্ধকার! আর আমি

তে পড়ে মুখ ঘস্‌টাচ্চি! যাহ'ক, কোনও রকমে সামলে
উঠে বসলুম,—কিন্তু আবার আর এক কাণ্ড আরম্ভ
।"

"কি রকম? কি রকম?"

"শুনতে পেলুম ঘরের বাহিরে মেয়েলি সুরে কে বিনিয়ে
য়ে কাঁদচে! এমন সকরুণ কান্না সে, যে আমার পাষাণ
ণও তার প্রতিধ্বনি ঠেলে উঠ্‌লো।"

অজয় ঠাট্টার সুরে বলিল: উঠ্‌লো নাকি?

নিখিল বলিল: হাঁ, তা উঠ্‌লো। কিন্তু তার নাকি সুরে,
র কিছুক্ষণ আগের সেই ভয়ানক ঘটনা গুলোয়, মনের
তর একটা সন্দেহ ছম্‌ ছম্‌ করতে লাগলো। ভাবলুম, তবে
সত্যিই কোন অপদেবতা আমার আশে-পাশে ঘুরে
ড়াচ্চে! তা নহিলে, এতরাত্রে এই নির্জ্জন জায়গায় মেয়ে-
নুষের কান্না কোথা থেকে এলো? খানিকক্ষণ বসে, চুপটি
'রে তার কান্না শুনতে লাগলুম। কান্নার মধ্যে ভাষার
কানও কেরামতি নেই,—সেই একঘেয়ে সুর! কি ক'রি,
কছু বুঝে উঠতে পারলুম না। শেষে স্থির করলুম,—যা থাকে
পালে, একবার সাহস ক'রে, পৈত্রিক প্রাণকে অপদেবতার
াতে সঁপে দিয়ে, দেখতে হবে ব্যাপার খানা কি! এইভেবে,
যমনি উঠেছি, আর অমনি কান্না থেমে গেল; আর একটা
মকা বাতাস এসে জানলা বন্ধ ক'রে দিলে! আর ঘরের
ভেতরেও এমন একটা ঝড় বইতে লাগলো, যে একখানা উড়ো

আর একবার পড়তে লাগলুম শানের মেঝেতে! আর সেই সঙ্গে—ওঃ! সে কি ভয়ানক শব্দ!"

"কি রকম? কি রকম?"

"একটা খটাখট্ খটাখট্ শব্দ আরম্ভ হ'ল ঘরের বাহিরে। ঠিক মনে হ'ল একটা বেহ্মদত্তি খড়ম পায়ে দিয়ে পায়চারি ক'রে বেড়াচ্চে! আমিত ভাই সেই শব্দ শুনে আবার একেবারে অজ্ঞান! কতক্ষণ যে সেভাবে ছিলুম, তা বলতে পারি নে। যখন আবার জ্ঞান হ'ল, তখন দেখি ঝড় থেমে গেছে,—আর সে খটাখট্ শব্দও আর নেই! তার পরিবর্ত্তে একটি স্ত্রীলোক,—অপরূপ সুন্দরী,—হাতে একটা প্রদীপ নিয়ে জানলার কপাট দুটো খুলে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখখানি দেখতে ঠিক ছাইয়ের মত সাদা! চুলগুলো এলোমেলো,—মাথায় কাপড় নেই! চক্ষু দুটির গহ্বর আছে, কিন্তু মনে হ'ল তাতে বুঝি চক্ষু নেই। মুখের হাঁ'টা কাণ পর্য্যন্ত লম্বা। তার ওপর আমার চক্ষু পড়বামাত্র সে আমায় সেই প্রকাণ্ড হাঁ বিস্তার ক'রে জিজ্ঞাসা কর্লে 'আমায় উদ্ধার কর্ত্তে পারো?"

আমি তার প্রশ্ন শুনে বেশ বুঝতে পারলুম, সে চায় তার পেত্নী-জীবন হ'তে উদ্ধার পেতে! আমি তাল ঠুকে বলে ফেল্লুম, "কি হ'লে তোমার উদ্ধার হয়?"

সেই সুন্দরী পেত্নীটা বল্লে: "আমায় আমার বাপের বাড়ীতে দিয়ে আসতে পারো?"

পেত্নীর আবার বাপের বাড়ী! বুঝতে পারলুম, আমার

সঙ্গে মস্করা কচ্চে! কিন্তু তবু তার এই সামান্য কাজটার ভার নেবার আমার সাহস কুলাল না। বল্লুম:

"আমাকে আবার ঠাট্টা করা কেন? তুমিত ইচ্ছে কল্লেই একনিমেষে চলে যেতে পারো!"

পেত্নী বল্লে: কি ক'রে?

—"কি করে আবার? তোমরা ত হাওয়া চড়ে বেড়িয়ে বেড়াও! একবার হাওয়ায় চাপো, অমনি হুস্ ক'রে বাপের বাড়ী গিয়ে পঁহুছিবে!"

কথাটা শুনে, অপর-জগতের মনুষ্যীটি তার ভ্রূদুটি কোঁচকালো! কথাটা যেন ঠিক তার মনঃপূত হ'ল না। খানিক কি ভেবে বল্লে: 'তাহ'লে তুমি আমায় নিয়ে যেতে পারবে না?"

"না বাবা! আমার অতো বুকের পাটা নেই যে, হাওয়ায় চড়ে তোমার সঙ্গে ঘুরে বেড়াই! রাগ করোনা! আমি একটু —ওর নাম কি,—তোমাদের জাতকে ভয় পেয়ে থাকি! আমায় অণুগ্রহ ক'রে আজকে রেহাই দাও। আজ যদি বাঁচি, কাল নিশ্চয়ই আর বাড়ীর দিকে না গিয়ে, একেবারে গয়ার দিকে রওনা হবো; এবং তুমিও যাতে এই পেত্নী জীবন থেকে উদ্ধার পেতে পারো,—তার জন্যে দু দশ টাকা খরচ ক'রে পিণ্ডদানটাও কর্ব্বো। আজ দয়া ক'রে আমাকে ছাড়ান দিয়ে, রাত্রের মত পৈত্রিক জীবনটা রাখতে দাও দেখি!"

দেখলুম পেত্নীর মনেও দয়া আছে। সে আর দ্বিতীয় বাক্য-ব্যয়টি না ক'রে, তখনই তার ছায়ার শরীরটি নিয়ে ঘর

থেকে বেরিয়ে গেল। পিদীমটা জানলার উপর রেখে দিয়েছিল, —সেটি যাবার সময় ইচ্ছে করেই না নিবিয়েই চলে গেলো! দয়াবতী পেত্নী!"

অজয় একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল: তারপর তুই কি করলি?

নিখিল বলিল: আর কি কর্ব্বো? সাতপাঁচ ভেবে, পেত্নীর মঙ্গল হ'ক—এই আশীর্ব্বাদ মনে মনে আওড়াতে আওড়াতে, বিছানার উপর শুয়ে পড়লুম একটু নিদ্রার চেষ্টায়! নিদ্রা অবিশ্যি হ'লনা,—কিন্তু ভয়টা খানিকটা যেন আপনি আপনিই চলে গেলো। সকালে উঠে,—আর কথাটি নয়— মামার সঙ্গে দেখা পর্য্যন্ত না ক'রে,—একেবারে চিরদিনের জন্য গুড্-বাই করলুম মামার বাড়ীর দেশকে। এই ঘটনার পর, আর কোনও ভদ্দর লোক সেখানে থাকতে পারে? উঃ! Narrow escape!"

(২)

দিন চারপাঁচ বাদে! ঠিক তেমনি সময় আবার ঐ তিনটি বন্ধু গঙ্গার ঘাটে হাওয়া খাইতে আসিয়াছে। ঘাটে আসিতে না আসিতেই বিধুভূষণ বলিল: "নিখিল? আজ যদি তোর পেত্নীর গল্প কর্ব্বি,—তাহ'লে তোরই একদিন কি আমারই একদিন!"

"কেনরে? সেদিন বুঝি বড় ভয় পেয়েছিলি?"

"ওঃ! সমস্ত রাত্রি গেছে অনিদ্রায়! এক একবার ঘুমের নেশা এসেছে, আর অমনি তোর পেত্নীটা"—

"আমার পেত্নীটা! তুই কি ভাবিস্, আমি কতকগুলো পেত্নীর মালিকানি কচ্চি?"

অজয় মাঝ থেকে বলিয়া বসিল 'মালিকানি হয়তো তুই না কর্ত্তে পারিস; কিন্তু মামার বাড়ীতে গিয়ে পেত্নীর সঙ্গে যে-রকম রোমান্স তুই করে এসেছিস্ সেদিন,—তাতে বেশ বোঝা যায়, তুই এখন পেত্নী-প্রুফ হয়ে গেছিস্!"

বিধু বসা-গলায় বলিল: 'আর পেত্নী পেত্নী করিস্নে ভাই! রাত্রিবেলায় ওদের নাম কর্ত্তে নেই!"

নিখিল বলিল: "কি ভীতু এই বিধুটা! তুই রাত্রে বেড়াতে বেরুস্ কেন?"

অজয় গঙ্গার জলের দিকে তাকাইয়া ছিল। বেশ ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্না; ঘাটের উপর হইতে নদীর প্রবহমান জল পর্য্যন্ত বেশ দেখা যাইতেছিল। তবে একেবারে পূর্ণিমার জ্যোৎস্না নহে, শুক্লা দ্বাদশীর রাত্রি অন্ধকারে-মিশানো আলোকে শুভ্র-বসনাবৃতা শ্যামাঙ্গীর মত দেখাইতেছিল।

অজয় বলিল: "নিখিল? কি একটা জলের ওপর সরে সরে যাচ্চেরে?"

নিখিল বলিল: "তাইতো! একটা মানুষ নাকি!

অজয় বলিল: মানুষ এতরাত্রে জল দিয়ে যাচ্চে? নাঃ! একটা কি রহস্য আছে!"

নিখিল বলিল: "পেত্নী নাকি? সেই রকমইত ঠেকচে!

মাথায় ঘোমটা দেওয়া—আর [illegible] গা কাপড়ে ঢাকা! অজয়? আমি ভাই বা-বা-বা-বাড়ী,—চ-চ-চ--"

বিধু সেই কথা শুনিয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ঘাটের উপর শুইয়া পড়িল। পেত্নীপ্রুফ্ নিখিলও তাহার চেয়ে অধিক সাহসিকতার পরিচয় দিলনা। উভয়ে জটাপটি করিয়া ঘাটের উপর তাল পাকাইয়া গেল।

অজয় চিরকালই ডানপিটে। তাহার বরাবরই ইচ্ছা, একবার কোনও ভূত কি পেত্নীর সহিত চাক্ষুষ আলাপ করে। এ পর্য্যন্ত তাহার সুবিধা একবারও ঘটে নাই! আজ বুঝি সে সুযোগ তাহার জুটিল।

সে নিখিল কিম্বা বিধুর দিকে না তাকাইয়াই, এই রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে জলের কিনারার দিকে নামিতে আরম্ভ করিল।

অধিক সময় লাগিল না, সে জলের কিনারার কাছে আসিয়া দেখিল, সত্যই এক অবগুণ্ঠনাবৃতা রমণী জল বাহিয়া চলিয়াছে।

অজয় হাজার সাহসী হইলেও এতরাত্রে, এরূপ অবস্থায় এক আপাদ-মস্তক-অবগুণ্ঠনাবৃতা রমণীকে দেখিয়া, থতমত খাইয়া গেল! তবে কি সত্যসত্যই এক প্রেতিনীর হাতে সে আজ পড়িল! সে যতটা সাহস লইয়া নামিয়া আসিয়াছিল,—তাহার অর্দ্ধেকটা চলিয়া গেল ঐ ছায়ার মত চেহারাটা দেখিয়া!

তবু অজয় সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিল: তুমি কে?

কিন্তু ততক্ষণে পেত্নীটা অনেক দূর এগ... গিয়াছে। যেদিকে নদীর স্রোত বহিতেছিল, সেইদিকে ... যাইতেছিল। একটা মানুষ জলের দিকে নামিতেছে ...য়া, সে আরও দ্রুতবেগে জল বাহিয়া গেল। বোধ হয়, মানুষটার কাছ থেকে সরিয়া যাইবার জন্য!

কিন্তু যখন সে পলাইবার মত ভঙ্গী করিতে লাগিল, তখন অজয়ও ছাড়িবার পাত্র নহে, সে-ও তাড়াতাড়ি জলে নামিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

দুজনের মধ্যে তখন চলিতে লাগিল জল দিয়া দৌড়িবার প্রতিযোগিতা।

ঘাট হইতে অনেক দূর সরিয়া গিয়া, আঘাটায় অজয় পেত্নীটার বসনাঞ্চল ধরিল।

কিন্তু একি! এত পেত্নী নয়! পেত্নী কি মানুষের মত চিৎকার করে! কাপড়ের আঁচলটা ধরিয়া ফেলিতেই, সে বিপন্নার মত চিৎকার করিয়া উঠিল।

তখন অজয় বজ্রগম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল: "তুমি কে?"

রমণী করযোড়ে মিনতি করিয়া বলিল "আমায় ছেড়ে দিন! আমি বড় বিপদে পড়ে পালাচ্ছি!"

"পালাচ্ছ? কেন, তোমার কি হয়েছে?"

"সে অনেক কথা। আপনাকে বলতে গেলে দেরি হয়ে যাবে! আমাকে সে ধরে ফেলবে!"

"কে ধরে ফেলবে?"

"তুমি কি স্বামীর কাছ থেকে পালাচ্ছ?"

"হাঁ,—সে আমায় বড় কষ্ট দেয়,—আমায় মারে! আজ আমাকে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে লোহা পুড়িয়ে ছ্যাঁকা দিয়েছে!

"কি ভয়ানক! কেন? তুমি কি দোষ করেছিলে?"

"কিছুই করিনি! তার স্বভাব, আমাকে মারা!"

"তাও কি কখন হয়? বিনাদোষে কেউ কখনও কাউকে মারে?"

রমণী প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল: "মারে গো মারে! সে ভয়ানক নিষ্ঠুর! তার প্রাণে মায়া-মমতা কিছুমাত্র নেই! সে ভয়ানক নেশাখোর!"

"নেশাখোর? কি নেশা করে? মদ খায়?"

"সে সব খায়! মদ, গাঁজা, গুলি, চরস, কিছু তার বাদ যায় না। নেশা ক'রে, শেষে আমার ওপর তার বীরত্ব আরম্ভ করে!"

"শুনে দুঃখিত হলাম। কিন্তু বলতে পারো, কে সে বদমায়েস লোকটা?"

"আমি স্বামীর হাতে মার খেলেও, তার নাম কি ক'রে মুখে নেবো?"

কথাটা শুনিয়া, রমণীর প্রতি অজয়ের মন এক অপূর্ব্ব শ্রদ্ধায় কোমল হইয়া আসিল। সে অন্তরের মধ্যে তাহাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিল না।

"আচ্ছা. তোমার শ্বশুরবাড়ী কোথায়?"

"ভৈরবপুর"

"ভৈরবপুর! এখান খেকে তিন চার কোশ দূরে, গঙ্গার পর যে ভৈরবপুর গ্রাম আছে?"

"সেইখানেই!"

"কি সর্ব্বনাশ!"

অজয়ের মনে পড়িয়া গেল, এই ভৈরবপুরে নিখিলের মামার বাড়ী,—এবং সেখানে সে এক পেত্নীকে দেখিয়া......

"তোমার শ্বশুরবাড়ী ভৈরবপুরে?"

"আজ্ঞে হাঁ! আমায় দয়া ক'রে ছেড়ে দিন, নইলে এখনই আমার সন্ধান পাবে···আর আমাকে হিড় হিড় করে আবার টেনে নিয়ে যাবে!"

"তুমি কি সেখানে আর যেতে চাওনা?"

"বাঘের মুখে কে ফিরে যেতে চায়?"

অজয় যুবাপুরুষ বটে,—কিন্তু তাহারও মন একথা শুনিয়া সহানুভূতিতে পূর্ণ হইয়া গেল।

"তবে তুমি এখন কোথায় যাবে?"

"কোথায় যাবো? ভগবান্ জানেন! এখন তো পালাচ্ছি, দেখি কোথায় গিয়ে উঠি!"

"তোমার বাপ মা নেই?"

"আছেন।"

"তাঁরা তোমায় দেখেন না?"

"মা খবর নেন; কিন্তু তাঁর শক্তি কতটুকু! বাবা বড় গরীব! তিনি আমাকে বিদেয় দিয়ে···"

"আতপুর! এখান থেকে বেশী দূর নয়!"

"আতপুর? যোগীন চাটুয্যের কেউ হও নাকি তুমি?"

"তিনি আমার বাবা!"

"ও! তুমি যোগীন চাটুয্যের মেয়ে! বিয়ে হয়েছে ভৈরবপুরে! আর বলতে হবেনা; এবার তোমায় চিনতে পেরেছি!"

"যদি চিনে থাকেন, দয়া ক'রে আমার স্বামীকে বলে দেবেন না। এই হতভাগীর ওপর এইটুকু করুণা আপনি করুন!"

"তোমার যা ইতিহাস শুনলুম, তাতে কোনও নৃশংস তোমায় দয়া না ক'রে থাকতে পার্ব্বে না!"

"তবে আমাকে ছেড়েদিন,—একবার শেষ চেষ্টা ক'রে দেখি!"

অজয় তাহার বসনাগ্র ছাড়িয়া দিল; কিন্তু কোনও কথা কহিতে পারিল না। এই নিপীড়িতা রমণীর অদ্ভুত দুঃখ কাহিনী শুনিয়া তাহার অন্তরের অন্তর পর্য্যন্ত শিহরিয়া উঠিয়াছিল।

অজয় সেখানে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, আর সেই বিপন্না অসমসাহসিকী রমণী নদীর জল বাহিয়া অস্ফুট-চন্দ্রালোকে কোথায় মিশিয়া গেল।

(৩)

অজয় ঘাটে ফিরিয়া আসিয়া দেখে, সেখানে জন-মানব নাই। বিধুভূষণ ও নিখিল বোধ হয় বাটী ফিরিয়া গিয়াছে।

অজয়ও বাটীর দিকে চলিল। পথে যাইতে যাইতে নানাপ্রকার চিন্তা আসিয়া তাহার মনকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিল। সকলের চেয়ে, ঐ নিরপরাধিনী নারী কেমন করিয়া তাহার স্বামীর হাত হইতে উদ্ধার পাইবে, সেই চিন্তাই তাহাকে বেশী ব্যাকুল করিয়া তুলিল। বাড়ী যাওয়া আর তাহার হইল না; কি ভাবিয়া সে আতপুরের পথ ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। এ তল্লাটের সমস্ত রাস্তাই তাহার সবরকমই জানা ছিল; বাড়ীর চেয়ে পথে, ঘাটে, মাঠেই তাহার তরুণ জীবনের অধিকাংশ অতিবাহিত হইত।

রাস্তা খুব বেশী দূর নয়, তবু একটু হেঁকা-বেঁকা। মাঠের মধ্য দিয়াই তাহার বেশীভাগ গিয়াছে। অন্ধকারে মাঠের আইল দিয়া যাওয়া সুকর নহে; পায়ে কাঁটাও অনেক ফুটিতে লাগিল। কিন্তু তবু সে চলিল।

আকাশে মেঘ দেখা দিল; জল আসিল। অজয় একটা গাছের তলায় দাঁড়াইয়া প্রকৃতির বাধা অস্বীকার করিল। শৃগাল ও নৈশজন্তু সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল; অজয় সে-সকল একেবারেই অগ্রাহ্য করিয়া তাহার গন্তব্য পথে চলিল। রাত্রে ঘোরা আজ তাহার জীবনে নূতন নহে।

আতপুরে পঁহুছিয়া সে যোগীন চাটুয্যের বাটীর দিকে চলিল। তখন মেঘ কাটিয়া আকাশ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। দশমীর চাঁদ লাবণ্যময়ী কিশোরীর মত আকাশে শোভা পাইতেছিল। আতপুর গ্রামে অট্টালিকার সংখ্যা খুবই কম ও কুটীরই বেশী। যোগীন চাটুয্যের বাড়ীও একখানি কুটীর

মাত্র, অজয় তাহা জানিত। চেনা ছিল বলিয়া বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিতে তাহার অধিক বেগ পাইতে হইল না।

কিন্তু কুটিরের কাছে আসিয়া সে যাহা শুনিল, তাহাতে চমকিয়া উঠিল। নীরব, নিঝুম রাতে গ্রামের শ্রান্ত বিশ্রামে অসির আঘাত করিয়া, এক সকরুণ আর্ত্তধ্বনি কুটীরের মধ্য হইতে বাহির হইতেছে। মাঝে মাঝে এক রুক্ষ পুরুষের কর্কশ তিরস্কার সেই ক্রন্দনধ্বনিকে সহস্রখণ্ডে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া কুটীরের পর্ণপত্রের ছাদ ফুঁড়িয়া বাহির হইতেছে। অজয় প্রথমে বিস্মিত হইল, কিন্তু তাহার বেশীক্ষণ বিলম্ব হইল না, ব্যাপারটা বুঝিতে। সে দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভিতরের ব্যাপার শুনিতে লাগিল।

(৪)

একটি স্ত্রীলোকের কণ্ঠে সকরুণ আর্ত্ত প্রার্থনা:—

"ওগো, তোমার পায়ে পড়ি,—আমায় ছেড়ে দাও! আমি এমন কাজ আর কর্ব্বো না!"

"আজ কেন কর্লি?" পুরুষ-কণ্ঠে প্রশ্ন হইল।

"বুঝতে পারিনি,—বুঝতে পারিনি! তোমার মারের জ্বালায়,"—আম্‌তা আম্‌তা করিয়া স্ত্রীলোকটি উত্তর দিল।

"আমার মারের জ্বালায়? মারের এখন হয়েছে কি,— এবার সুদ শুদ্ধু তোকে এর ডবল ক'রে মার্ব্বো।"

"ওগো, মরে যাবো—মরে যাবো! আর আমায় মেরোনা! যে মার মেরেছো, তাই আমি সহ্য কর্ত্তে পার্চ্ছিনা!"

'সহ্য কর্ত্তে পারছিস্ নে? মাখনের শরীর তোর, না?"

'ওগো ছেলেবেলা থেকে কখনও মার খাইনি। আর আজ মি এই তিন বচ্ছরে আমাকে আধমরা ক'রে ফেলেছো।"

'আধমরা ক'রে মেরেছি? কই দেখি, তোর কি হয়েছে?"

"দেখবে? এই দেখো আমার পিঠে কালশিরে দাগ পড়ে গেছে। মামার হাতের কব্জি থেকে রক্ত ঝুঁজিয়ে পড়ছে,—এখনও!"

"ওসব দেখে কি পুরুষ মানুষের মন গ'লে পড়ে? আমিও দি তোর মত মেয়ে মানুষ হতুম,—তাহ'লে তোর কালশিরে আর রক্ত দেখে ভড়কে যেতুম! আমি মরদ আদমি, বুঝতে পারলি?" স্বরটা খুবই রুক্ষ এবং বিকৃত।

"কিন্তু আজ আমি কিছুতেই যেতে পার্ব্বো না!"

'আলবত্ যেতে হবে!"

'এই এতটা রাস্তা, প্রায় তিন চার কোশ হবে! এই ভোর রাত্রে না ঘুমিয়ে কি মানুষ যেতে পারে?"

কিন্তু পুরুষের মনে দয়া হইল না; সে বলিল:—

'তবে এসেছিলি কেন?"

"এসেছিলুম কেন? সে তুমি বুঝতে পার্ব্বেনা! যে শিকার করে, সে বুঝতে পারে না, বাণ বিঁধলে হরিণের কি কষ্ট হয়! পাঁঠা কাটবার সময় যে ঘাতক, সে বুঝতে পারেনা পাঁঠার কি যন্ত্রণা! কেন যে পাঁঠা মুক্তি পাবার জন্যে ছট্‌ফট্ করে, কেন যে হরিণ শিকারীর হাত এড়াবার জন্য ছুটে বনে লুকোয়,—এ 'কেন'র উত্তর বুঝতে পারে যে ভুক্তভোগী,—অপরে পারে না!"

একথায় পুরুষ একটা বীভৎস ব্যঙ্গ করিল। তাহা শুনিয়া অজয় কাণে আঙ্গুল দিল।

অনেকক্ষণ সে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঘরের ভিতরের উত্তেজিত বাদ-প্রতিবাদ শুনিতে লাগিল। গলা শুনিয়া সে বেশ বুঝিতে পারিল, গঙ্গার জল বাহিয়া যে নারী সেই রাত্রে স্বামীর হিংস্র আশ্রয় হইতে পলাইয়া বাপের বাড়ী আসিতেছিল, এ সেই নারী। কথাবার্ত্তার ছন্দে পুরুষটি যে তাহার স্বামী, তাহাও সে অনুমান করিয়া লইল।

আকাশে সহস্র সহস্র নক্ষত্র মিটি মিটি করিয়া জ্বলিতেছিল। একটা শিমূল গাছের ডালে পেচক তাহার চিৎকারে অশুভ সূচনা করিয়া দিতেছিল। তখন প্রায় শেষরাত্রি; চন্দ্র অস্তে গিয়াছে।

অন্ধকারে একা দাঁড়াইয়া অজয় বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল; শ্রান্তি আসিয়া তাহাকে বাড়ীর দিকে রওনা হইতেই উদ্যোগ করাইতেছিল। এমন সময়ে, হঠাৎ সে শুনিল, কুটীরের ভিতরের রমণীটি আর্ত্তস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিল; পুনঃ পুনঃ মারের শব্দ তাহার কাণে গেল।

অজয় আর স্থির থাকিতে পারিল না; বেশ বুঝিতে পারিল ঐ অসহায় রমণীকে সাহায্য করা একান্তই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। তখন অসুরের মত শক্তিতে সে কুটীরের দরজায় পদাঘাত করিল। জীর্ণ দরজা বলিষ্ঠ যুবার সজোর পদাঘাতে তখনই খুলিয়া গেল।

অজয় দরজা বাহিয়া দাওয়ায় গিয়া উঠিল, এবং আর এক পদাঘাতে পাশের ঘরের দরজা উন্মুক্ত করিয়া ফেলিল। এই ঘরের মধ্যে যে দৃশ্য দেখিল, তাহাতে চিন্তা করিবার আর তাহার কিছুই ছিল না। ঘরের কোণে যে প্রদীপটি মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল, তাহারই নিষ্প্রভ আলোকে সে দেখিল, একটি কদাকার পুরুষ সেই নারীর চুলগুলি বামহাতের বজ্র-মুষ্টিতে ধরিয়া, ডানহাতে তাহাকে কিল ঘুঁসা মারিতেছে। নারী ঝঞ্ঝাবাতবিস্রস্তা লতিকার মত ভূমিতে লুণ্ঠিতা। নৃশংস পুরুষটি তাহার পিঠের উপর বসিয়া ঐ নারকীয় বীরত্বের অভিনয় করিতেছে।

অজয় তাড়াতাড়ি গিয়া ঐ নরপশুর গলা ধরিয়া তাহাকে টানিয়া নামাইয়া দিল। বলে সে তাহাকে পারিল না, কেননা অজয় তাহা অপেক্ষা যথেষ্ট অল্পবয়সী এবং বলিষ্ঠ।

হাতের আস্তানা গুটাইয়া অজয় জিজ্ঞাসা করিল "কেমন, এতেই হবেত? না আরও কিছু চাই?"

আরও কিছু চাই কিনা, অজয়ের প্রতিপক্ষ তাহার কোনও সোজাসুজি উত্তর দিল না। সে শুধু ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া, বিস্মিতের ভূমিকা অভিনয় করিতে লাগিল। একজন অপরিচিত যুবককে সহসা ঘরের মধ্যে দেখিয়া সে শুধু বলিল: কে তুই?

অজয় বলিল: আমি যেই হইনা কেন! ফের যদি ওঁর গায়ে হাত তুলিস্,—আমি তোকে খুন ক'রে ফেলবো!

অজয়ের চেহারা দেখিয়া লোকটা ভয় পাইয়া গেল।

বেত্রাহত কুকুর-বৎ ঘর হইতে সুড়্ সুড়্ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

(৫)

তাহার পরদিন বৈকালে, অজয় ও নিখিলে কথা হইতেছে।

নিখিল জিজ্ঞাসা করিল: "হ্যাঁরে অজয়! তুই কাল রাত্রে যে গঙ্গার জলে একটা ছায়া দেখে, তার পেছন পেছন দৌড়ে গেলি,—তার কি হ'ল রে ?"

অজয় গম্ভীর হইয়া বলিল: "ওঃ! সে একটা ভয়ানক পেত্নী! তুই তোর মামার বাড়ীতে যে পেত্নীটাকে দেখেছিলি, সেই পেত্নীটা! আমাকে অনেক দূর টেনে নিয়ে গিয়েছিলো।"

নিখিল শঙ্কিত বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল: "কি ক'রে জানলি, এটা সেই পেত্নী ?

"আমায় যে সে পরিচয় দিলে!"

"কতদূর টেনে নিয়ে গিয়েছিলো ?"

"ওঃ! সেকথা আর জিজ্ঞেস্ ক'স্‌নে! একেবারে তার বাপের বাড়ী!"

"বাপের বাড়ী কি রে? পেত্নীদের কি আবার বাপের বাড়ী থাকে নাকি ?"

"থাকে না'তো জানতুম! কিন্তু এর তো দেখলুম রয়েছে!"

নিখিল বিশ্বাস করিল কিনা বুঝা গেলনা। সে জিজ্ঞাসা করিল :

"তার বাপের বাড়ী কোথায় ?"

অজয় সটান বলিল : আতপুরে !

"আতপুরে ? আতপুরে কার বাড়ীরে ?

"তোর মামার শ্বশুরবাড়ী ! সেখানে দেখলাম যোগীন চাটুয্যে রয়েছে ! যোগীন চাটুয্যেরই বাড়ী। পেত্নীটা যোগীন চাটুয্যের মেয়ে !"

"দূর্ ! তা কখনও হয় ? যোগীন চাটুয্যের মেয়ে ত আমার মামী ! সেতো জলজ্যান্ত বেঁচে রয়েছে !"

"সে বেঁচে রয়েছে সে কথাও ঠিক, আবার পেত্নী হয়েছে সে কথাও ঠিক ! তোর মামা যদি বেঁচে থেকে বেহ্মদত্তি হ'তে পারে—তোর মামী পেত্নী হ'তে পারে না ?"

"কি বলচিস্ তুই ?"

"ঠিক বলচি ! তবে আয়, আমার সঙ্গে দেখবি আয় ! তোকে দেখিয়ে দি, সত্যি তারা বেহ্মদত্তি আর পেত্নী কিনা !"

নিখিল অজয়ের কথা শুনিয়া খানিকটা হাঁ করিয়া ..হল। ভিতরের রহস্যটা কিছুতেই তার বুদ্ধির মধ্যে আসিতেছিল না।

কিন্তু অজয়ও তাহাকে হেঁয়ালিটা খুলিয়া বলিবে না, যদিনা সে তার সঙ্গে আতপুরে গিয়া স্বচক্ষে দেখিয়া আসে ! নিখিল আর কিছুর জন্য না হউক, এই ভৌতিক ব্যাপারটার কৌতূহল নিবারণ করিবার জন্য অজয়ের সহিত চলিল।

(৬)

যোগীন চাট্‌য্যের বাড়ীর নিকটে আসিয়া নিখিল ডাকিল: "দাদামশাই!"

কেহ উত্তর দিল না।

নিখিল আবার ডাকিল। তথাপি নিরুত্তর। উঠানে একটি কাঠমল্লিকা ফুলের প্রকাণ্ড লতাগাছ ঝোঁপঝাঁপ লইয়া দক্ষিণ বাতাসে অঙ্গ নাড়াইতেছে, নিখিলের শুধু সেইটুকুই লক্ষ হইল।

দরজা খোলা ছিল। উভয়ে ভিতরে ঢুকিল।

দাদামশাইএর উত্তর না পাইয়া নিখিল ডাকিল ঠানদিদিকে। ঠানদিদিরও কোন উত্তর নাই।

উভয়ে দাবায় উঠিল। সেখানে বাঁশের আলনায় ঠানদিদির লালপেড়ে শাড়ী কাপড় ও দাদামশাইয়ের ছেঁড়া ময়লা থান ঝুলিতেছে। ঘটি-বাটি ইতস্ততঃ পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু মানুষ কেহ নাই।

নিখিল ও অজয় অবাক্ হইয়া গেল, কিন্তু কি করিবে ঠিক করিতে পারিল না। এমন সময়ে এক প্রৌঢ় ব্যক্তি ডান হাতে হুঁকা ধরিয়া টানিতে টানিতে, খোলা দরজার ভিতর দিয়া বাড়ীর মধ্যে আসিলেন। দুইজন নূতন ব্যক্তিকে দাবায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন: তোমরা কা'কে খুঁজচো?

নিখিল জিজ্ঞাসা করিল: এঁরা সব কোথায় গেলেন, বলতে পারেন, মশায়?

ভদ্রলোকটি বলিলেন "আজ সকাল থেকে এঁরা নিরুদ্দেশ ! ল রাত্রে জামাই এসেছিল,—এসে অনেক গোলমাল করে। য়েটাকে একেবারে আধ-মরা ক'রে ফেলে। মেয়েটা কাল ত্রেই জামাইয়ের বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছিল। জামাই নতে পারে—তাই এসে মারধোর করে। বুড়ো-বুড়ী তাই খে, মনের কষ্টে বোধ হয় বিবাগী হয়ে গেছে!"

নিখিল জিজ্ঞাসা করিল: আর তাঁর মেয়ে?

"মেয়েটার যে কি হ'ল, তা এখনও আমরা ঠাহর করে তে পাচ্ছিনে। হয় জামাইটা তাকে রাত্রেই নিজের বাড়ী নে নিয়ে গিয়েছে,—আর না হয় বাপ মা'র সঙ্গে করে য়ে কোথায়ও চলে গিয়েছে। আমরা পাড়ায় থাকি, অতটা ক বলতে পারলুম না!"

অজয় ও নিখিল প্রৌঢ়ের কথা শুনিয়া পরস্পরের মুখ ওয়া-চায়ি করিতে লাগিল। অজয় বলিল: ভূত পেত্নীর াও, কিছু বোঝবার যো নেই!

নিখিল একথার কোনও উত্তর না দিয়া ঘরের দরজার কে তাকাইল। দরজা ভেজান, কি ভিতর হইতে বন্দ, াহা সে বুঝিতে পারিল না। পরীক্ষা করিবার জন্য নিকটে াসিয়া ঠেলিল। দরজা ভিতর হইতে বন্দ।

নিখিল তখন সিদ্ধান্ত করিল, নিশ্চয়ই কেউ ভিতরে আছে। া কড়া নাড়িল, কেহ দরজা খুলিল না। তখন সে উচ্চৈঃস্বরে াকিল: "কে ভেতরে আছ?"

নীরব নিঝুম ঘর থেকে শুধু প্রতিধ্বনি ফিরিয়া আসিল।

পার্শ্বে একটি ছোট জানালা ছিল, সেটা যেমনি জীর্ণ, তেমনই ভগ্ন। অজয় আসিয়া তাহাতে তাহার সবল মুষ্ট্যাঘাত করিল; জানালার কবাট খুলিয়া গেল।

অজয় উঁকি মারিয়া দেখে, এক নারী লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া, আটচালার ছাদ হইতে ঝুলিতেছে। তাহার মুখ দেখিলে ভয় হয়। চোখ-দুটো যেন ভাঁটার মত কোটর হইতে ঠিকরাইয়া বাহিরে চলিয়া আসিয়াছে। নাক দিয়া রক্ত বাহির হইয়াছে, এবং লেলিহান জিহ্বা দাঁত দিয়া কামড়ানো। সেখান হইতেও জমাট রক্ত নির্গত হইতেছে। চুল-গুলো একান্ত আলুলায়িত। শুধু চুলগুলিই বাতাসে একটু-আধটু নড়িতেছে, এতদ্ব্যতীত, সমস্ত দেহই নিস্পন্দ, নিথর, জীবন-হীন!

একখানা পাকানো কাপড় ঐ নারীর গলদেশে ফাঁসি দেওয়া। মাটি হইতে একহাত ঊর্দ্ধে অলক্ত-রঞ্জিত চরণ দুইখানি ঝুলিতেছে, এবং একখানি শাড়ী হতভাগিনীর অঙ্গ হইতে মাটিতে লুণ্ঠমান।

অজয় সেই দৃশ্য দেখিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। নিখিল ও পল্লীবাসী সেই ভদ্রলোকটি অজয়ের চিৎকারে জানালার নিকটে আসিয়া সমস্ত দেখিল। অজয় বলিল: উঃ! কি ভীষণ দৃশ্য! চোখে দেখতে পারা যায় না। উঃ! এই নিরপরাধিনী রমণীর কি ভীষণ পরিণাম!"

আলম্বিত শবদেহ বুঝি একটু কাঁপিয়া উঠিল।

বাল্মীকির ডাকাতি

—:o:—

যাঁহারা হিন্দুদিগের বাইবেল রামায়ণ নামক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, যে-মহাকবি উক্ত পুঁথি রচনা করিয়াছিলেন, তিনি প্রথম-বয়সে এক অতি দুর্দান্ত দস্যু ছিলেন। তাহার পর তিনি কিভাবে মহা-ডাকাত হ'তে মহাকবি ও মহামুনিতে পরিণত হ'ন, তাহার গল্পও নিশ্চয় পড়িয়াছেন। কিন্তু বাল্মীকির দস্যুতার কোন উপাখ্যান এ পর্য্যন্ত কেহ কখন পড়েন নাই,—তাহার সহজ কারণ এই যে, উক্ত উপাখ্যানগুলি তাল-পত্রে লিখিত হইয়া ক্রমশঃ কালক্রমে হিমালয়ের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে কবরস্থ হইয়া পড়ে, এক্ষণে পুনর্জন্মের গুণে বিংশ-শতাব্দীর গল্প-লেখকের কল্পনা-পত্রে এসে আবির্ভূত হইয়াছে।

একটা গল্প বলি। বড় মজার।

একদা রত্নাকর (মহর্ষি বাল্মীকি ডাকাত-জীবনে যে নামে চল্‌তি ছিলেন) সমস্তদিন শীকার-অন্বেষণে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, যখন কোনও যমালয়ে-টিকিট-কাটা পথিকের সাক্ষাৎ পাইল না, তখন বড়ই বিমর্ষ হইয়া সে একটি বন-পথের পার্শ্বে বসিয়া এদিক-ওদিক তাকাইতে লাগিল। অনেকক্ষণ প্রতীক্ষার পর হঠাৎ দেখিল, দূরে একজন মূল্যবান্-বেশভূষা-পরিহিত ব্যক্তি

আগমন করিতেছে। আরও নিকটস্থ হইলে দেখিল, তাহার গাত্রে মণি-মাণিক্যাদি-খচিত জামা, পরণে বহুমূল্য চীনাংশুক কি পারস্য-দেশজাত বস্ত্র, পায়ে মতি-ঝালর-ঝকমকায়িত পাদুকা, এবং মস্তকে যবনদেশ-শিল্পজাত টুপি। দেখিয়া বড়ই উৎফুল্ল হইয়া উঠিল রত্নাকর। যেমনই পথিক আক্রমণের সুলভ সীমানায় আগমন করিয়াছে, অমনি রত্নাকর ব্যাঘ্র-লম্ফে গিয়া তাহার গলা টিপিয়া ধরিল।

মানুষের দেহ-যন্ত্রের এমনিই অদ্ভুত পারস্পরিক সৌহার্দ্য যে, তাহার গলা টিপিলেই জিহ্বা বাহির হইয়া পড়ে ও চক্ষুদ্বয়ও সহানুভূতিতে কপালে উঠিয়া যায়। পথিকেরও সেই অবস্থা ঘটিল। তথাপি অনেক কষ্টে আপনার কণ্ঠস্বর উদ্ধার করিয়া, বেচারী সানুনয়ে বলিল: ওরে বাবা ডাকাত! আমি গোটা কতক কথা বলি, তারপর আমাকে মেরো!

দস্যু রত্নাকর ধমক দিয়া বলিল:—

—কই, এমন কথা ত তোমার সঙ্গে আমার নেই!

—না, তা নেই বটে! কিন্তু জানতো, রাজারা ফাঁসি দেবার আগেও, ভাল ক'রে পেটভরে খাইয়ে তবে ফাঁসি দেয়। আর তুমি আমাকে হত্যা কর্বার আগে, গোটাকত কথা বলতে দেবে না!

রত্নাকরের হঠাৎ কি মনে হইল, বলিল: আচ্ছা, তোমার ওপর আমাদের বে-আইনী একটু দয়া কর্লুম! বলো কি বলবে!

পথিক বলিলেন: বলবো আর কি ছাই ভস্ম! একটু দুঃখের কথা!··দেখো ভাই, আমি বরাবর ভারি তপস্যা করেছি। পনেরো-শো বচ্ছর করেছি ডিগ্‌বাজি-তপস্যা, উনিশ-শো বচ্ছর বাদুড়-তপস্যা,—আর সাড়ে তেইশ-শো বচ্ছর বল্মীকের গাদার ভেতর সেঁধিয়ে করেছি গিরগিটি-যোগ! এইসব প্রাণান্তক যোগ আর তপস্যার বহর দেখে, পরমব্রহ্মঠাকুর বড়ো খুসী হলেন আমার ওপর!··একদিন, রাত বারোটার সময় স্বপ্ন-রথে চ'ড়ে, বাষ্প-ময় শরীরে তিনি আমার সম্মুখে এসে আবির্ভূত হ'লেন। এসে বললেন: বৎস? তোমার 'যায়-যাবে-যাক্-প্রাণ' তপস্যায় আমি ভারি খুসী হয়েছি। এখন, বরং বৃণু।

'আমি বললুম: ঠাকুর? যদি দয়া হ'ল, তাহ'লে এইবর দিন, যেন আমি এখনই কৈবল্য লাভ করি।

'তিনি 'তথাস্তু' বলতে যাচ্ছিলেন,—খানিকটা ধোঁয়া মুখ থেকে বেরিয়ে 'ত' অবধি বেরিয়েছে, এমন সময় কোত্থেকে এক মোমে-তৈরি পুতুলের মত দেবতা হঠাৎ সেখেনে এসে হাজির হলেন। তাঁর সর্ব্বাঙ্গ ফুলের মালা দিয়ে জড়ানো,—আর হাতে ফুলের তৈরি ধনুক আর বাণ। তিনি আবার ফিস্‌ফিস্ ক'রে কথা ক'ন, আর এমন চোখ ঠারেন যে, তা দেখলে বাপ-পিতামহ'র নাম পর্য্যন্ত ভুলে যেতে হয়। যদিও, ঠাহর করে দেখলুম, চোখটি তাঁর কাণা, তবু সেই কাণা চোখে এমন ধরফের শিলা-বৃষ্টি করলেন যে, মনে হ'ল আমার সমস্ত দেহটাই জমে গেল।

—'তিনি কি হিমালয়ের কোনও লেড়কা টেড়কা?' রত্নাকর বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল।

—মোটেই না। পরে জানলুম, তিনি হিমালয়ের জামাইয়ের এক পরম শত্রু। একবার তাঁর সঙ্গে চালাকি কর্তে গিয়ে বরবাদ ভস্ম হয়ে গিয়েছিলেন।...যাক্, সেকথা! হ'ল কি ব্যাপারটা জানো? তিনি এসেই পরম-ব্রহ্ম ঠাকুরকে বললেন: কচ্চ কি ঠাকুর? এ লোকটা যে আমার খাজনা দেয়নি! এ কেমন করে কৈবল্য পাবে?

—'তারপর?' কপালে ভ্রূদুটো তুলে রত্নাকর-দস্যু জিজ্ঞাসা করিল।

—তারপর, আমি আপত্তি তুলে বললুম, কই আমিত ওঁর জমিতে বাস করিনে।...তাতে 'উড়ে-এসে-জুড়ে-বসা' পুষ্প-ময় জমিদার হো হো ক'রে খানিকটা হেঁসে বললে: বাপুহে? এ সমস্ত-পৃথিবীটাই আমি পত্তনি নিয়েছি। এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন প্রাণী আছে, যে মহারাজ মদন-দেবকে খাজনা দেয় না?

বাধা দিয়ে রত্নাকর জিজ্ঞাসা করিল: মদন-দেব? সে আবার কোন্ দেবতা? আমিত জানি শুধু দুই দেবতাকে! এক হলেন যমরাজ, যাঁকে রোজই আমি পার্শেল পাঠিয়ে থাকি! আর এক হলেন ষষ্ঠীঠাকরুণ, যাঁকে আমার পরিবার ফি-বছরেই একবার পুজো দিয়ে আঁতুড়-ঘর থেকে বেরোন! তার জন্যেই ত আমার এই ডাকাতি-টাকাতি, যাকে তোমরা পাপ-কাজ ব'লে থাকো।'

কপিঞ্জল (এই দস্যু-হস্তগত পথিকটির নাম) তখন বললেন: তোমার গিন্নি ফি-বছর ষষ্ঠী পূজো করেন তো? তাহ'লেই মদন-দেবের কাছে খাজনা ঠিক পৌঁছেচে! এই ষষ্ঠী-ঠাকরুণের জ্যেঠামশাই হলেন মদন-দেব। জমিদারীটা আগে মদন-দেবের, তারপর উত্তরাধিকারী-সূত্রে ষষ্ঠী-ঠাকরুণের হয়।

—'বটে? তা, এতো ইতিহাস আমি কি করে জানবো?' ডাকাত-মশায় বলিল।

—যাক্ ওসব কথা! তারপর কি হ'লো শোনো!

—'হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি বলো। আমার পেট জ্বলচে।' দস্যু রত্নাকর বলিল।

—তারপর, মশাই, সেই চোখ-ঠারা পত্তুনিদারটা নাছোড়বান্দা! আমি তখন কি করি, বললুম তাঁকে, 'আচ্ছা, আমার কৈবল্য-প্রাপ্তিটা আগে হয়ে যাক্, তারপর তোমার বাকি খাজনা শোধ করে দেবো!'...কিন্তু বাম-দিকে তাকিয়ে দেখি, এইসব গণ্ডগোলে পরমব্রহ্ম-মশাই সরে পড়েছেন। তখন কি করি? কাবুলিওয়ালার হাত থেকে যেমন ক'রে লোকে উদ্ধার পায়, সেইভাবে মদন-দেবের খাজনা দিতে স্বীকার করে এলুম।

'কি ক'রে খাজনা দিলে?'

'সে কথাটাই বলছি, শোনো। মনকে জিজ্ঞাসা করে জানলুম, এই দেবতাটিকে ধর্ম্ম-মতে খাজনা দিতে হ'লে, কর্ত্তে

হবে একটি বিবাহ। কাজেই তারই চেষ্টায় বেরুলুম। কিন্তু আমার জটা আর লোটা-কম্বল দেখে কেউ আমাকে কন্যাদান কর্ত্তে চায় না। সকলেই জিজ্ঞাসা করে, 'আপনি কি চাকরি করেন?' 'কতো মাহিনে পান?' 'পৈত্রিক টাকা-কড়ি কিছু আছে?' দূর্ তোর নিকুচি করেছে! গেলুম মহারাজ গবেশ্বর শঙ্কা-বর্ম্মের রাজসভায়। গিয়ে বললুম: 'রাজন? আপনার কাছে একটি ভিক্ষা চাই!'

—আজ্ঞে করুন।

—আপনার কন্যাটিকে আমি বিবাহ কর্ত্তে চাই। হয় বিবাহ দিন, নয় আপনাকে শাপ দেবো!'...মহারাজ আমার কথা শুনেত হো হো ক'রে হেসে উঠলেন। বললেন: শাপ দেবেন কেন, ঠাকুর? গ্রাম্য-সাহিত্যে একটা কথা চলিত আছে 'কাঙাল, ভাত খাবি, না, আঁচাবো কোথায়?' আমারও হ'ল তাই। আমার কন্যার এ পর্য্যন্ত কোন পাত্র জোগাড় কর্ত্তে পারিনি; কেননা আমরা বঙ্গজ কুলীন, আর আমার জমিদারীটাও (আপনাকে গোপনে বলি) এক মাড়োয়ারি ক্রয় করে নিয়েছে। কাজেই কিছু যৌতুক দিতে পার্ব্বোনা ব'লে, কোন অর্ব্বাচীন বিয়ে কর্ত্তে চায়না। এইভাবে পাত্র-মরুভূমিতে উৎসের সন্ধান কর্ত্তে কর্ত্তে, আমার মেয়ের বয়েস (সেটাও কানে কানে বলি) কিছু-বেশী পঁচিশ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

'আমি বললাম 'তা'তে কি হয়েছে? মেয়েটি স্ত্রীলোক ত?'

রাজা বললেন: নিশ্চয়ই! আমি তার প্রতিশ্রুতি দিতে পারি।' ব্যস্। আমি মহা-আনন্দে স্বীকার করলাম। রাজাও আনন্দিত। সেইদিনই তাঁর মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেলো!

কপিঞ্জল গল্প বলিয়া যাইতেছিলেন বটে, কিন্তু দস্যু উহাতে কোনও রস-বোধ করিল না। সে বলিল: দূর্! যতো সব বাজে কথা! শ্বশুরের কাছে কিছু টাকা-কড়ি আদায় কর্তে পেরে থাকো ত বলো!'

—আরে, সে কথায় আসচি এখনই। আর একটু ধীর হয়ে শোনো না!

—বলো, বলো!

—বিয়ে ক'রে কিছুদিন শ্বশুর-বাড়ীতে থেকেই মদনদেবের খাজনা খুঁজতে লাগলুম, কেননা আমার নিজের তো কোন বাড়ী নেই, পরিবারকে আনবো কোথায়? কিন্তু, কিছুদিন যেতে না যেতেই আবিষ্কার করলুম, গবেশ্বর হ'লেও কোন শ্বশুরই 'ঘর-জামাই' নামক বস্তুটি পছন্দ করেন না তখন, কাজেই সেখান থেকে সরে পড়ে আবার বনে এলাম। কিন্তু মদন-জমিদারের খাজনা! তাঁর নায়েব-গোমস্তারা তাগাদা আরম্ভ কর্লে।

—সে আবার কারা?' রত্নাকর জিজ্ঞাসা করিল।

—এই ধরো বসন্তকাল, মলয়-পবন, আম্র-মঞ্জরী, কাকের একটা পুষ্যিপুত্তুর আছে তার নাম কোকিল,—এরা সব! তবু

তাদের একরকম ঠেকিয়ে রেখেছিলুম। কিন্তু হঠাৎ পরশু পাঁজি খুলে দেখি,—চারদিন পরে জামাই-ষষ্ঠী! আর কি থাকতে পারি! শ্বশুর-বাড়ী যেতেই হবে! কিন্তু মনে পড়লো এবার স্ত্রীর কাছে হাজির হ'তে হ'লে, আমার ঝক্‌ঝকে বেশভূষা পরে যাওয়া উচিত। গেল বারে যখন শ্বশুর-বাড়ীতে ছিলুম, তখন আমার বাঘছাল আর খোলা গা দেখে, শ্রীমতী বড় হেনস্থা কর্ত্তেন। এবারে "বাবু" সেজে যেতেই হবে।

'কিন্তু ঝক্‌ঝকে বেশ-ভূষা পাই কোথা? বড় চিন্তায় পড়লুম। শেষে, বন-পথে নজর দিয়ে দেখি, এক নেতৃ-স্থানীয় ক্ষত্রিয় নানা চাকচিক্যময় মণি-মাণিক্যখচিত বেশভূষা প'রে মৃগয়ায় বেরিয়েছেন। একবার ভাবলুম, তাঁর কাছে গিয়ে এই জামা-কাপড়গুলো চেয়ে নি। কিন্তু তারপর মনে হলো, সে আমায় দেবে কেন? হয়তো, বেশী জোর কর্ত্তে গেলে, আমাকেই মৃগয়া করে বসবে।

'কাজেই আমাদের,—অর্থাৎ তপস্বীদের,—অস্ত্র বার কর্লুম। এসে ক্ষত্রিয় রাজার সুমুখে গিয়ে, তপস্যার প্রভাবে চোখ থেকে আগুন বার ক'রে, রাজাকে দিলুম ভস্ম ক'রে! কেবল তার বেশ-ভূষাগুলো পোড়ালুম না।

—"অ্যাঁ? বলো কি ঠাকুর?" রত্নাকর পরম বিস্মিত হয়ে বললো, "বিনা-দোষে ভদ্রলোকটিকে তুমি হত্যা করলে?"

—হত্যা কর্ব্বো কেন? ভস্মীভূত কর্লুম!

—আরে, ভস্ম হ'লেই ত সে প্রাণে মারা গেল!

—তা গেল বৈ কি!

—অ্যাঁ? তাহ'লে তোমাতে আর আমাতে তফাত কি? আমি লাঠি মেরে পথিককে হত্যা করি,—তুমি তপস্যার জোরে তাকে হত্যা করলে! ছুই-ই তো হত্যা,—তা যে-রকমেই করো!

কপিঞ্জল তখন মাথা নাড়িয়া বলিলেন: হাঁ, হত্যা বটে! তবে,—

—ও তবে-টবে আর নয় ঠাকুর! আমিও যে পাপে পাপী, তুমিও সেই পাপে পাপী! আমি ছেলে-পুলেদের খাওয়াবো ব'লে ডাকাতি করি,—তুমি আবার বউয়ের মন রাখবার জন্যে ডাকাতি করেছো! তুমি তাহ'লে আমার চেয়ে বড়ো পাপী! আমি একটা সৎকার্য্যের জন্যে অসৎ-কার্য্য করি, তুমি অসৎ-কার্য্যের জন্যে অসৎ-কার্য্য করেছো! তুমি ত্রিবিধ পাপে দোষী! এক, ইন্দ্রিয়-সেবা; দ্বিতীয়,—হত্যা; তৃতীয়,—

কপিঞ্জল কিছুমাত্র ঘাবড়াইয়া না গিয়া বলিলেন:—ওসব পাপ আমার গায়ে লাগবে না!

—'কেন?' বিস্মিত ও ঈর্ষা-পরবশ হইয়া রত্নাকর জিজ্ঞাসা করিল।

—আরে আমি যে তপস্যা করি! তপস্যার পুণ্যে ওসব পাপ কোথায় ধুয়ে যাবে!

এই উত্তর শুনিয়া রত্নাকর আরও ঈর্ষাপন্ন হইল ; বলিল : বটে ? তোমাদের বেলায় লোককে হত্যাকরা পাপ নয়,— আমার বেলাই পাপ ! ..আচ্ছা দাঁড়াও, আমিও কাল থেকে তপস্যা কর্বো !

—ভাল কথা ! তোমারও তাহ'লে পাপ থাকবে না। তবে আর কি.—আজ আমাকে হত্যা করে আবার নতুন পাপ কর্বে—কেন ? আমাকে ছেড়ে দাও !

রত্নাকর তখন জোরে কপিঞ্জলের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল : তা হবে না ! আজ আমার ছেলে-মেয়ে-বউ উপোষ করে আছে ! আজ, তোমার কাছে যা আছে, সব দিয়ে যেতে হবে ! নইলে,—

বলিয়া হাত ছাড়িয়া গলা টিপিয়া ধরিল ! কপিঞ্জল বলিল : আঁরে, আঁরে, কঁরো কিঁ ? ব্রাঁহ্মণ-বঁধ ! সাঁত পুঁরুষ নঁরকস্থ !...তাঁর চেঁয়ে এঁকটা রঁফা কঁরো !

গলা-টিপুনিটা একটু কমিল। রত্নাকর বলিল : কি রফা বলো।

—আচ্ছা, আমার কাছে ত পয়সা-কড়ি কিছু নেই ! আছে শুধু এই দামী দামী জামাকাপড়গুলো,—যেগুলো আমি সেই ক্ষত্রিয়কে স্বর্গে পাঠিয়ে পেয়েছিলুম। তা বেশ, এগুলোর তুমি অর্ধেক লও—আমি অর্ধেক নি' !

রত্নাকর একটু ভাবিল, তারপর বলিল : "আচ্ছা, বেশ, তা'তেই রাজি !

তখন বেশ-ভূষা ভাগ হইল। রত্নাকর লইল পরণের 'চীনাংশুক' খানা, আর গায়ের মণি-মাণিক্যখচিত ফতুয়া! আর কপিঞ্জলের ভাগে পড়িল পায়ে মতি-ঝালর-চক্‌মকায়িত জুতো ও মাথায় টুপি!

লিখিতে লজ্জা করে, কপিঞ্জল উলঙ্গ-অবস্থায় পায়ে বহুমূল্য পাদুকা ও মস্তকে মণিময় টুপি পরিয়া শ্বশুর-বাড়ীতে গমন করিলেন।

তিনি এই অবস্থায় শ্বশুর-বাড়ীতে যাতে তাঁহার শ্যালিকা-বৃন্দ ও ভার্য্যা কর্ত্তৃক কিরূপ অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন, তাহা সম্মার্জ্জনী-সংহিতায় বিশেষ-ভাবে লিখিত আছে।... এখানে আর তাহার বিশেষ বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই।

হাঁটু-ভাড়া

(১)

অবিনাশবাবু শান্ত, শিষ্ট, বৃদ্ধ ভদ্রলোক। দাড়ি আছে, চুল নাই। বই আর খবরের কাগজ প'ড়ে প'ড়ে মাথায় টাক গজিয়েছে—আর নাপিতের খরচ বাঁচাতে গিয়ে, গজিয়েছে দাড়ি। অদ্ভুত সমন্বয়,—তবে অপ্রাকৃতিক নয়!

ভদ্রলোকের লেগেছে এক মকদ্দমা। ওটা মানুষের জন্মগত বিপত্তি নয়, বরাত-গত। বাঙলাদেশে (শুধু বাঙলাদেশে বা বলি কেন! সব দেশেই) কাহারও যদি এক ইঞ্চি মাত্র জমি স্বকীয় হলো তা হ'লেই মকদ্দমাও সঙ্গে সঙ্গে বিনা-অভ্যর্থনায় বিনা-পরিচয়ে তাঁর পশ্চাতে এলো। বিষয়-সম্পত্তির ওটা যমজ ভাই।

ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, কেননা মকদ্দমার বিচার-স্থান হ'লো বারাসতে। কলকাতা থেকে সেখানে যেতে হবে। অবিনাশবাবু বৃদ্ধ লোক, তাহার উপর তাঁর একটি পা পোকায়-খাওয়া ডালের মত। গাছের অঙ্গ কিন্তু গাছকে বাঙ্গই করে বেশী। ব্যস্ত হয়ে এরকম হয়েছে।

যেদিন মকদ্দমার প্রথম খবর পেলেন, সেদিন থেকেই নিদ্রা ওঁকে ছেড়ে কোথায় গেল, তা উনি বুঝে উঠতে পারেন না। তবু উকিলরা জাল পেতে কিছু কিছু নিদ্রা ধরে দেন।

দিন পড়তে লাগলো। ওটা আদালতের জন্ম-গত অভ্যাস, বিচারার্থীর ইচ্ছাগত নয়। কিন্তু তবু, দিন পড়তে পড়তে এমন

এক জায়গায় আটকে গেল যে, সেদিন আর সেখানে না গেলেই নয়। অবিনাশবাবুকে যেতে হলো বারাসতে খোঁড়া পা নিয়ে, আদালত ও কলিযুগকে অভিশাপ দিতে দিতে।

যাবার সময়ে বেশী কষ্ট হলো না, কেননা উকিলবাবুর সবিনয় আদেশে দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনে রেলগাড়ীতে বসবার স্থান পেয়ে ছিলেন। বারাসতে যখন গিয়ে পৌছিলেন, তখন বেলা মাত্র সাড়ে নয়টা। কাজেই আদালত ঘরে গিয়ে বিলম্ব করতে হলো।

সূর্য্য আকাশের পূব দিকে ছিল, মাঝখানে উঠলো; ক্রমে মাঝখান থেকে পশ্চিম দিকে ঢললো; কিন্তু অবিনাশবাবুর ডাক পড়লো না। তাঁর বোঝা উচিত ছিল যে, সূর্য্যের সঙ্গে তাঁর মকদ্দমার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু মহাভারত পুরাণ পড়ে পড়ে তাঁর বোঝবার বুদ্ধিটা এত ধার্ম্মিক হয়ে গিয়েছিল যে, আর কেউ যে তাঁর প্রতি অধর্ম্ম করে নি,—এবং সূর্য্য পশ্চিমে হেলে পড়লেও তাঁর মকদ্দমা না উঠাটা আদালতের পক্ষে অনুচিত হয় নি,—এটা যেন দুই আর দুয়ে চারের মত তাঁর কাছে সহজ ঠেকলো।

সেদিন আর তাঁর মকদ্দমা উঠলোই না। বেলা ৩টার সময়ে উকিলবাবু বলে দিলেন, 'আজ আর আমাদের মকদ্দমা হবে না, মুনসেফবাবু একটা বড় মকদ্দমা নিয়ে ব্যস্ত আছেন।"

যাক্, সমস্ত দিনটা প্রায় অনশনে যাওয়ার পর দাঁড়ালো এই যে, অনশন তাঁর কোন উপকারেই লাগলো না, এবং কলিকাতা থেকে বারাসতে কষ্ট ক'রে খোঁড়াতে খোঁড়াতে আসাটাও বিড়ালের নিরামিষ-রন্ধন-গৃহে জানালায় গা-ছোঁড়ে প্রবেশের মত একেবারেই বাজে হয়ে গেল।

উকিলবাবু বললেন, আপনি এখনই যদি ষ্টেসনে যান তা'হলে একখানা গাড়ি পেতে পারেন। আমার যেতে দেরি হবে; যাবার সময় একাই আপনাকে ফিরতে হবে। পারবেন তো?

দার্শনিক অবিনাশবাবু উত্তর দিলেন:—পৃথিবীতে আসবার সময় একা এসেছি, যাবার সময়েও একা যাবো। সেটা যদি পারি,—বারাসত থেকে কলকাতা, এ আর একা পারবো না? —হাঁ, ভাল কথা, আপনার ফিয়ের টাকাটা!

—ওটা আপনার কাছে থাক্। বাড়ী গিয়ে হিসেব ক'রে তখন দেখা যাবে।

মনিব্যাগটা পকেট থেকে বার করেও আবার সেটা স্বস্থানে রেখে দিলেন অবিনাশবাবু। পরে লাঠিটা আর মকদ্দমা-সম্বন্ধীয় কাগজ-পত্রগুলো অন্য হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন ভদ্রলোক ষ্টেসনের দিকে।

সেখানে গিয়ে শুনলেন, গাড়ীর এখনও আধঘণ্টা দেরি। কাজেই ষ্টেসনের ওয়েটিং ঘরের একখানা বেঞ্চিতে ব'সে এটা, ওটা, সেটা দেখতে লাগলেন।

যখন মানুষের মাথা কিছু কাজ করতে থাকে, তখন উদর পোষা কুকুরটির মত চুপ করে থাকে। কিন্তু মাথার কাজ বন্ধ হলেই উদরের বাড়ে চঞ্চলতা। ভদ্রলোকের চুপ ক'রে বসে বসে ক্ষিদে পেয়ে গেল।

খবর নিয়ে নিয়ে, ঢুকলেন গিয়ে এক খাবারের দোকানে। খবর আর খাবার। শব্দ দু'টো কাছাকাছি। কাজেই দেরি হ'লো না।

তেলে-ভাজা লুচি আর অম্বরোগের অবশ্যম্ভাবী পিতা আলুর-দম গোটাকতক খেয়ে,—তবু দম পেলেন শরীরে। পরে আবার ষ্টেসনের প্লাটফর্মে আসতেই দেখেন বাষ্পীয়-যান পাগ্লা নক্ষত্রের মত ছুটে আসচে।

ভাগ্যে আগে টিকিটি কিনে রেখেছিলেন, তা না হ'লে গাড়ীতে উঠতেই হয়তো সাহস হ'তো না! এবারেও সেকেণ্ড ক্লাশের টিকিট, কেননা উকিলবাবু বলে দিয়েছিলেন অন্য ক্লাশে বড় ভিড় হয়, উঠতে পারবেন না।

গাড়ী থামতেই, কোথায় সেকেণ্ড-ক্লাশ খোঁজ করতে লাগলেন কিন্তু বাত্-গ্রস্ত হাঁটু প্রতিকূল হ'লো! অনেক খোঁজা খুঁজি করেও, যে ক্লাশের দাম দিয়েচেন, সেটা নজরে এলো না। অতো বড়ো লম্বা গাড়িখানা, মানুষের ছোট চোখ কি ক'রে এক সঙ্গে সমস্ত দেখতে পারে?

— টং-টং-টং! ষ্টেসন-মাষ্টার মশাই মুখস্থ পড়ার মত ঘন্টার হুকুম দিলেন।

কাজেই, সুমুখে যে গাড়িখানা পেলেন, তাইতেই উঠতে হয়। কিন্তু অবিনাশবাবু ওঠেন কি ক'রে? প্রত্যেক কম্পার্টমেন্টের প্রত্যেক দরজায়, দাতা ধনীর দরজায় ভিখারীর ভিড়ের মত— দুর্ভিক্ষের সময়ে চাউলের দোকানে ক্রেতার দলের মত,—অগণন যাত্রী নানা ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে প্রবেশ-পথ আটকে আছে। কেউ দরজার হ্যাণ্ডেলটাকেই জীবন-মরণের সম্বিস্থল ব'লে আঁকড়ে ধরে রয়েছে,—কতকগুলো লোক বাহিরে বাদুড় ঝুলচে, কতকগুলো

চারদিকে,—কতকগুলো গাড়ীর অঙ্গ একেবারেই ধরতে পারে নি,—ধরে রয়েছে শুধু অন্য যাত্রীগুলোকে যাহারা পূর্বজন্মের পুণ্যের জোরে আজ গাড়ীর বাইরের হ্যাণ্ডেলটা ধরতে পেরেছে।

এই সব দেখে-শুনে অবিনাশবাবু যে কি করবেন, প্রথমটা তা বুঝেই উঠতে পারলেন না। কিন্তু পরের মুহূর্তে যা করলেন, তা একেবারেই তাঁর জ্ঞাত-সারে বা বুদ্ধি-পরিকল্পনা অনুযায়ী নয়; তাঁর শরীরের অভ্যন্তর-প্রদেশে যে আত্মা বিদ্যমান,—সেই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী দেবতাই বোধ হয় এ কাজে তাঁকে নিয়োগ করলে।

একজন গোয়ালার একটা বাক ছিল খানিকটা বাইরে বেরিয়ে; গোয়ালা-মহাশয় ভিতরে ঢুকে গিয়েছিলেন, কিন্তু সেখানে এমন যায়গা ছিলনা যে তার বাকটাও স্থান পায়। প্রায় হাত দুয়েক বাইরেই সোজাভাবে ঝুলছিল।

গাড়ী চলতে আরম্ভ করেছে, কাজেই অবিনাশবাবু উপায়ান্তর না দেখে সেই বাকটাকেই বেশ আঁকড়ে ধরলেন, এবং ঝুলতে ঝুলতে চলে গেলেন খানিকটা পথ।

বাকটা ওঁর ভারে বোধ হয় আরও বেঁকে গিয়েছিল, কাজেই তার স্বত্বাধিকারী খুব জোরে ভিতর দিকে টেনে নিল, এবং সেই সঙ্গে অবিনাশবাবুও আশ্চর্য্য ও অপ্রত্যাশিত টাগ্ অব্-ওয়ারিং উপায়ে (যেন ক্রেনের সাহায্যে) গাড়ির দরজার ভিতরে ঢুকে গেলেন।

আগেই বলেছি, এতটা কাণ্ড যখন ঘটছিল, তখন অবিনাশবাবুর জ্ঞান বুদ্ধি একেবারেই বিকল হয়ে গিয়েছিল, তা না হ'লে কখনই

এমন অঘটন-ঘটনায় তিনি পটীয়ান হতে পারতেন না। যাহোক, শেষে যখন তাঁর লুপ্তজ্ঞান আবার ফিরে এলো, তখন দেখেন, সত্যি-সত্যি গাড়ির জঠরের মধ্যে তিনি এসে গেছেন, কাজেই বাইরে ঝোলার বিপত্তি আর তাঁর নেই।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন, যেন প্রাণটা যে ফিরে পেয়েছেন তারই প্রশস্তি পৃথিবীকে জানাবার জন্যে! কিন্তু সেই দীর্ঘনিঃশ্বাসটাও পথ পেলো না মুক্ত-স্বাধীনতায় প্রবাহিত হ'তে—এতো লোকের ও মালের ভিড় গাড়ির ভিতরে। যেখানে গিয়ে অবিনাশবাবু প্রথম বায়ুপথ থেকে গাড়ীর মেঝে স্পর্শ করলেন, সেখানেই রইলেন আটকে। কেননা, সম্মুখেই গোটা পাঁচ-সাত দুধের হাঁড়া (হাঁড়ি নয় !) কক্ষতলকে সাময়িক ভাবে ইজারা ক'রে রেখেছিল, এবং সেই সকল হাঁড়ার কণ্ঠলগ্ন দড়িগুলো ঢোড়া সাপের মত এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কাজেই আবার একবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন অবিনাশবাবু, কামরায় বসবার যায়গা মোটেই প্রাপ্তব্য নয় দেখে! শেষের দীর্ঘনিঃশ্বাসটা দুঃখ ও যন্ত্রণার।

বাতের হাঁটু অসুবিধার বাত্ শোনে না; সে চায় বিশ্রাম। অথচ বিশ্রামের নেই তিলার্ধ জায়গা। কাজেই গাড়ীর মধ্যে ঢুকেও চারিদিক ভিক্ষার্থী-নয়নে চাইতে লাগলেন,—যদি কেউ তাঁকে বৃদ্ধ ও বাতগ্রস্ত দেখে, স্বতঃ-উৎসারিত করুণার ধাক্কায়, নিজে যায়গা ছেড়ে, তাঁকে নিজ থেকে ডেকে, সেখানে বসিয়ে দেয়। কিন্তু হায় ! সে দধীচী মুনির দিন যে অনেকদিন চলে গেছে।

কেউ তাঁকে বসতে দেবার প্রস্তাব করলো না দেখে তিনি উদ্বিগ্ন

য়ে নিজেই কক্ষস্থ সকলকে ডেকে, উচ্চৈঃস্বরে বললেন : বাবারা !···
দি একটু বসতে দাও এই বুড়োকে !

কিন্তু বাবাদিগের মধ্যে কোন বাবাই সন্তান-স্নেহে ডগ-মগ হয়ে
ার কথার জবাব দিলোনা।

—হাঁগা, অনেকে তো বসে রয়েছো! কেউ একটু উঠে আমাকে
সতে দেবেনা ?···হাঁটুর বাতে যে এক মিনিট দাঁড়াতে পারিনে,
াবা ?

কে কা'র কথা শোনে! একে ট্রেণ যাওয়ার শব্দ, তাহার উপর
যাত্রীদিগের কোলাহল! আর সে কোলাহলে কি কোনও সুর-তাল-
লয় আছে? শিশুর কান্না, যুবকের গর্জ্জন, বৃদ্ধের গ্যাঙানি,
স্ত্রীলোকদের লজ্জার পেছনে দাঁড়িয়ে নির্লজ্জ চিৎকার,—এ যেন শব্দ-
দৈত্যের সাক্রোশ সহিংস ব্যায়াম চলেছে! অবিনাশবাবু কোনও
ব্যবস্থা করতে পারলেন না, তাঁর বেতো পা'কে বিশ্রাম দিতে!

খানিকটা সময় কাটলো,—দু' একটা ষ্টেসনও গেল। অবিনাশ-
বাবুর মনে হ'তে লাগলো, বারাসত থেকে তার পরের ষ্টেসন যেন
কলকাতা থেকে একেবারে দিল্লী, এতদূর! পায়ের হাঁটুটা এত
ঝন্‌ঝন্ করতে লাগলো, যেন সেটা সময় পেয়ে দ্বিগুণ খাজনা আদায়
করে নিচ্ছে। পাশেই একজন পাঞ্জাবী-পরা ছোকরাবাবু বেঞ্চিতে
বসেছিল, অতি-সাহস ক'রে তাকে বললেন: বাবু, একটু যায়গা
হবে না তোমার পাশটাতে !···একটু যদি কুঁচকে বসো···

—কুঁচকে বসবো ? আমরা কি ববার মশাই ?

—তাহ'লে, তোমার হাঁটুর ওপর একটু···কি বলো···বস্‌-বোঝাই

ছোকরা ভ্রূ কুঁচকে বললে : সে কি মশাই. হাঁটুর ওপর বসবেন ? আপনি কি আমার কনে বউ ?

একটা হাসির রোল চারিধারে উঠে গেল, এই উত্তরে। অবিনাশবাবু এতে বড় অপ্রতিভ হ'লেন।

বামপাশে একজন হাত-কাটা-জামা-পরা গম্ভীর-প্রকৃতির লোক বসে ছিল, সে বললে : মোর হাঁটুর ওপর বইতে পারেন। কিন্তু— কিন্তু (মাথাটা একটু নীচুদিকে গুঁজে বললে)—হাঁটুর ভারা কিন্তু দিবান।

লোকটাকে দেখলে মনে হয়, চাষা-ভুষো, সাদা-সিধে, রবীন্দ্র-নাথের "মূক মৌন" দলের অন্তর্ভুক্ত লোক! তার মনের মাঝে এমন উদার-ধর্মের প্রকাশ দেখে অবিনাশবাবুর বড়ই তাজ্জব লাগলো। তিনি সানন্দ মুখে বললেন।—

নিশ্চয় দেবো, নিশ্চয় দেবো! সে কি কথা?...হেঁ, হেঁ...... রেলওয়ে কোম্পানিকে দিলুম এক টাকা দু' আনা—তারা লোককে বসবার ব্যবস্থা করে দেয় না,—তুমি সেটা করে দিলে,—সুতরাং তোমাকে দেওয়া নিশ্চয় আমার উচিত!

—এক টাহা দো' আনা দিলেন ক্যান্? ভারা তো বারাসাত থেহে মোট্টে পাঁচ আনা?

অবিনাশবাবু উত্তর দিলেন :—আমি সেকেন্ ক্লাশের টিকিট কিনেছি যে! যাচ্ছি থার্ড ক্লাশে। কি করবো বাবা? গাড়ীতে যে ভিড় তাতে মানুষই টিকটিকি হয়ে যায়, তা সেকেন্ ক্লাশটা থার্ড ক্লাশ হয়ে যাবে,—এ আর আশ্চয্যি কি?...যাক্ তা' হলে বাবা, তোমার হাঁটুর ওপর আমি বসলুম!

বলতে বলতেই অবিনাশবাবু ঝড়ে-উপড়ানো গাছের মতো ধপাস্ ক'রে পড়লেন সেই ভাড়া-করা হাঁটুর ওপর। মুখে আওড়াতে লাগলেন, "আঃ—বাঁচালে বাবা তুমি,—আঃ তোমার নামটি কি বাবা?

মাথা নীচু ক'রে লোকটি বললো: "এজ্ঞে মোর নাম ইস্‌মাইল!"

যে সময় যদি একটা কেউটে-সাপ ফণা তুলে ঘরের মধ্যে দেখা দিত,—তাতেও অবিনাশবাবু ততো চমকে উঠতেন না,—যতো চমকে উঠলেন ঐ নামটা শুনে।

কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তখন চলছিল।

কিন্তু ঐ চমকানো-পর্য্যন্তই সার! তার ওপর তিনি গেলেন না। হাঁটুতে বাত এমনি জিনিস যে কুমীরের মাথার ওপরও বসতে হ'লে তিনি বসতেন।

অনেকের চক্ষু তাঁর ওপর পড়লো তিনি কি করেন, তা দেখবার জন্যে! কিন্তু কোন চক্ষুকেই তিনি উত্তর দান করলেন না। বসে রইলেন—সেই ভাড়া-করা হাঁটুর ওপর, কিছু সন্দিগ্ধ, অধিক উদাসীন, মুখাকৃতি নিয়ে।

মনের মধ্যে একবার একখণ্ড মেঘ দেখা দিল, 'যদি পেছন দিক থেকে লোকটা একখানা ছোরা বার করে, আর সেখানা বসিয়ে দেয় পিঠের ওপর,—না, না! তখনই সান্ত্বনার ঝড় মেঘটা উড়িয়ে দিল।)—ও জাতটা বড়ো অতিথি-পরায়ণ! অতিথির ওপর অনীতি,—ও জিনিষটা ওদের কোরাণ মনুসংহিতায়

একেবারেই বারণ আছে!'...এই ভাবে অনেক রকমে মনকে চোখ ঠারতে লাগলেন অবিনাশবাবু।

—'কই, তারাটা দিন বাবু?' ইস্‌মাইল খানিক পরে অবিনাশবাবর কাছে ভাড়া চাইলো।

—'হাঁ, এই যে'—ব'লে, অবিনাশবাবু পকেট থেকে তাঁর মণি-ব্যাগটা বার ক'রে সকলের চোখের সুমুখেই খুললেন। ব্যাগের মধ্যে অনেকগুলো পাঁচ-দশটাকার নোট,—কোটরের ভেতর থেকে যেমন ভাবে পায়রা উঁকি মারে,—সেই ভাবে উঁকি মারলো। অবিনাশবাবু খুঁজছিলেন খুচরো দুয়ানি, সিকি। সেগুলো কিন্তু পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের জোরে পড়ে ছিল একেবারে তলায় বা কাগজের নোটের ভাঁজের ভেতর।

দু'টো আঙুল ঢুকিয়ে, সেগুলোকে খুঁজে খুঁজে, টেনে হিঁচড়ে বার ক'রে আনলেন, যেমন ক'রে মেছুনিরা বার করে দামের মতো সিঙি মাছ, চুবড়ির ভেতর থেকে!

অনেক কষ্টে একটি সিকি খুঁজে বার ক'রে অবিনাশবাবু দিলেন তাঁর ভাড়া-প্রত্যাশী উপকারীর হাতে।

লোকটি তাই নিল কোনও রকম প্রতিবাদ বা অপবাদ না ক'রে। কিন্তু হাটুর ভাড়াটা কেন এতো কম হ'লো, তার কৈফিয়ৎ দাতা স্বয়ংই দিতে আরম্ভ করলেন নিতান্ত ভদ্রলোকের মতো!

—"থার্ড ক্লাশের ভাড়া বোধ হয়, চার আনা কি পাঁচ আনা হ'বে! সেই টেই তোমাকে দিলুম। বুঝ'লে?...তবে তুমি এটা ভাড়া ব'লে

জন্যে দিলুম!···হাজার হোক্, তুমি আমার জন্যে এতটা কষ্ট স্বীকার করলে!···কেমন?"

এত বড়ো ব্যাখ্যা বা কারণ-বিশ্লেষণ গ্রহীতার কাণে গেল কিনা, বোঝা গেল না, তবে মনের মধ্যে যায়নি, একথা ঠিক। কেন না, পরক্ষণেই লোকটাও দেনা-পাওনার হিসেবটা কবরস্থ ক'রে জিজ্ঞাসা করলো: 'কোথা যাবান কোত্তা?'

—যাবো? এই দমদম ষ্টেশনে নামবো বাবা!

কোনও কথা নেই শ্রোতার! সে শুধু তার চোখটা খানিকটা-সময় বুজিয়ে রইলো মাত্র!

ভদ্রতার খাতিরেই হোক্, কি প্রত্যুপকারের আর এক কিস্তি তুরুপ মারবার জন্যেই হোক্, অবিনাশবাবু উল্টে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কোথায় নামবে বাবা?

—মুই যাবো শিয়ালদা!

—বটে? বেশ,—তা'হলে তুমি,—আমি নেমে গেলে,—তার পরে নামবে!···ঐ বুঝি ক্যাণ্টনমেণ্ট এলো!···ব্যস্. এর পরের ষ্টেসনেই আমি নামবো!···তোমার হাঁটুর বোঝাও খালাশ হয়ে যাবে!

লোকটির মুখের ডান কোণটা একটু বেঁকলো মাত্র,—সে আর কোন কথা কইলো না।

(২)

দশ পনেরো মিনিটের মধ্যেই গাড়ী খানা ভস্ ভস্ করতে করতে

এসে থামলো দমদম ষ্টেসনে। অবিনাশবাবু পকেটটা একবার হাত দিয়ে অনুভব ক'রে, ছাতা লাঠি আর বেতো পা নিয়ে, নামলেন প্লাটফরমে।

নামবার সময়ে তাঁর আতিথ্য-পরায়ণ হিতকারীকে বললেন: "চললুম বাবা। তা হ'লে তুমি শিয়ালদায় যাও। আমি নামি! ...হাঁ, বেঁচে থাকো বাবা! আজ যে উপকারটা করলে এই বুড়ো লোকের—ভগবান্—অর্থাৎ কিনা খোদা,—তোমার ভাল কর্ব্বেন! ...হাঁ, নিশ্চয়ই ভাল কর্ব্বেন! এমন না-বলতে উপকার কে করে বাবা?" পুঞ্জীভূত এবং পুনঃ পুনঃ কথিত ধন্যবাদ মুখ-পিচ্‌কিরি দিয়ে ছড়াতে ছড়াতে অবিনাশবাবু গাড়ী ত্যাগ করলেন।

দমদম ষ্টেসন থেকে কলকাতা মহানগরীর নাড়ী-ভুঁড়িতে প্রবেশ করতে হ'লে বাস (Bus) ধরতে হয়। অবিনাশবাবু সেই উদ্দেশ্যে ষ্টেসনের রাস্তা ধরে মোড়ে এসে দাঁড়ালেন।

বাস্ ধারাবাহিকভাবে আসে বটে, কিন্তু অবিরত ধারায় নয়। কিছুক্ষণ সময় অন্তর-অন্তর তা আসে। এখানে নিয়ম, পাঁচ মিনিট অন্তর আসবে। কিন্তু এই সময়টা কখনও রবারের মত প্রসারিত হয়ে যায়, কখনও বা কচ্ছপের মত সঙ্কুচিত হয়।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল অবিনাশবাবুকে। আকাশে মেঘের ভিড় জমে ছিল, হঠাৎ আরম্ভ হ'ল বর্ষণ। অবিনাশবাবু পাশের একখানা পান-বিড়ির দোকানে গিয়ে অনুমতি নিয়ে, একখানা বাধ্‌কা-বিকল বেঞ্চে গিয়ে বসলেন। আরও একজন কি দু'জন যাত্রী সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন বা ব'সে ছিলেন। ঝুপ ঝুপ ক'রে বৃষ্টি! অবিনাশবাবু

বক্ষিতে বল্লে মাথাটাকে শুষ্ক রাখলেন বটে, কিন্তু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা জামা-জুতোকে অনাক্রান্ত রাখতে পারলেন না।

যাহো'ক, ভিজে গেলেও মনে একটু আনন্দ এলো এই ভেবে যে এই বৃষ্টির জন্যে বাসে বেশী ভিড় হবে না। বাতগ্রস্ত হাঁটুটাকে বাঁচিয়ে গাড়ীতে উঠতে পার্বেন।

কিন্তু যখন একখানা বাস মিনিট আষ্টেক সময় পরে এসে কাছেই দাঁড়ালো তখন অবাক্ হয়ে গেলেন দেখে যে, হঠাৎ নানান্ অলক্ষিত পথ-গুহার ভিতর থেকে অগণিত যাত্রী—পিল্ পিল্ ক'রে বেরিয়ে বাসে উঠবার দরজায় অসম্ভব ভিড় তৈরি করলে। কেহ মাথায় ছাতা, কেহ ছাতা বন্ধ ক'রে,—কেহ হাতে পুঁটলি, কেহ কাঁধে ঝুড়ি নিয়ে,—যেন অভিমন্যুর সমর-ব্যূহ রচনা ক'রে ফেললে। অবিনাশবাবু বেতো পা'টা টেনে টেনে, অতি কষ্টে দরজার কাছে এসে ঠেলাঠেলি করতে লাগলেন।

অনেক লোক। হঠাৎ তার মধ্য হ'তে নজর পড়লো তাঁর, ইস্‌মাইলের মত একজন লোকও ঠেলাঠেলি কচ্ছে। ইসমাইল? সে যে বললে, সে শিয়ালদায় যাবে? হবে বা! কি মনে হয়েছে, হঠাৎ হয়তো তাঁর পরে ট্রেণ থেকে নেমে পড়েছে।

"ইস্‌মাইল? তুমি এখানে?" সেই ভিড়ের মধ্যেও তিনি একটা শব্দভেদী বাণের মত প্রশ্ন ছুঁড়ে মারলেন।

কে কা'র কথা শোনে! পরক্ষণেই হঠাৎ ইস্‌মাইল হারিয়ে গেল, এবং তিনিও ও-বিষয়ে আর মাথা না ঘামিয়ে বাসে ওঠবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

মনে হ'লো যেন বুকটার ওপর কিসের একটা আঁচড় লাগলো। তা অসম্ভব কি? যে ভিড়! বুকটা যে ধড় থেকে আলাদা হয়ে যায় নি, এই ঢের!

অনেক কষ্টে, অনেক ঠেলা সহ্য করে উঠলেন বাসের ভেতর। নেপোলিয়ন প্রুসিয়া জয় ক'রে যেমন আনন্দ অনুভব করেছিলেন, সেইরকম একটা বাহাদুরির আনন্দ অনুভব করলেন অবিনাশবাবুও।

বৃদ্ধ ভদ্রলোককে দেখে, একজন তরুণ যুবাপুরুষ তড়াক্ ক'রে বসবার জায়গা থেকে উঠে ওঁকে বললে: বসুন আপনি, আমার এই যায়গায়!

—বেঁচে থাকো বাবা! বড় উপকারটা করলে তুমি আজ!

—'কিছু না, কিছু না! আপনি বসুন।

একজন যাত্রীকে তার ন্যায়-সঙ্গত পূর্ব্বাধিকৃত জায়গা থেকে তুলে দিয়ে, সেখানে নিজে বসতে গেলে, একটা অবিচারের বাষ্প মনের ভেতর আসে। অবিনাশবাবুরও তা এলো; কিন্তু শারীরিক কষ্টে স্বার্থান্ধ হয়ে, তিনি অবিচারের কথাটা হজম ক'রে সেখানে বসে পড়লেন।

কণ্ডাক্টার এসে টিকিটের পয়সা চাইলো। অবিনাশবাবু পয়সা বার কর্ব্বার জন্যে পকেটে হাত দিলেন, কিন্তু হঠাৎ চমকে উঠলেন সেখানে মনি-ব্যাগ না পেয়ে।

—সে কি? আমার মনি-ব্যাগ?

জামার দুই পাশের পকেট, ভিতরকার পকেট সব খুঁজলেন, কোথাও মনি-ব্যাগ নেই! সর্ব্বনাশ! কি হলো?

যে যুবকটি নিজের যায়গা ছেড়ে দিয়ে উদার প্রকৃতির উদাহরণ দেখিয়ে তাঁকে বসিয়েছে, সে বললে; সে কি? মনি-ব্যাগটা খোয়ালেন?

—খোয়ালুম? সে কি? কেউ তুলে নিলে না কি?

—তা'তে আর সন্দেহ আছে? এই মোড়টা পকেট-মারদের একটা বড় আড্ডা! ওরা ট্রেণ থেকে পেছন নেয়!...ট্রেণ থেকে এসেছেন বুঝি?

—হাঁ! তাইতো! বারাসাত থেকে আসচি!

যুবকটি সহানুভূতির হাঁসি হেঁসে বললে: "ঐ ঠিক হয়েছে! আপনার পকেটে মনি-ব্যাগ ছিল, দেখতে পেয়েছে! তার পর থেকেই নিয়েছে আপনার পেছন!...ব্যাগে কত টাকা ছিল?

অবিনাশবাবু দুঃখে প্রথমটা কথা কইতে পারলেন না! এত বড়ো বেকুব ব'নে যেতে, তিনি মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলেন।...গাড়িতে সেই 'ইস্‌মাইল' নামক লোকটির হাঁটুর ওপর ব'সে, তাকে 'হাটুর ভাড়া' দেবেন ব'লে যে তার সুমুখেই মনি-ব্যাগটা খুলেছিলেন, সে কথাটা মনে পড়লো! কিন্তু, আবার সন্দেহ হ'লো, এমন উপকারী লোক কি এমন পকেট-মার হ'তে পারে?

যুবকটি অবিনাশবাবুকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে, আবার জিজ্ঞাসা করলো, "কত টাকায় ঘা মারলো মশাই?"

অবিনাশবাবু বললেন: মকদ্দমা করতে গিয়েছিলুম বাবা! আদালতে কতোরকম খরচ হয়, তাই ভেবে টাকা পঞ্চাশ সঙ্গে নিয়েছিলুম।...উকিলকে কি দিতে গেলুম,—সেও টাকাটা নিলে না;

বললে, বাড়ী গিয়ে নেবো!···তা হ'লে টাকা পঞ্চাশই গেলো আর কি!

—'বাবু? টিকিটকা পয়সা'? কণ্ডাকটার আবার হাঁকলো!

—কিচ্ছু নেই আর কাছে! আমার মনি-ব্যাগ কে তুলে নিয়েছে!

—এঃ! বুড়াবাবু! খেয়ালমে রহনে হোতা! এইস্তান্‌ বেকুব হ্যায় আপ?

অবিনাশবাবু থতমত খেয়ে গেলেন। মনে হলো, সমস্ত পৃথিবীটাই তাঁর পায়ের তলায় কাঁপছে! কণ্ডাকটার আর পয়সার জন্যে পীড়াপীড়ি করলো না। অপহৃত-পকেট যাত্রীদের ওপর তাদেরও দয়া হয়!

অবিনাশবাবু বাড়ীতে এসে যখন পৌঁছলেন, স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন: মকদ্দমায় কি হলো?

অবিনাশবাবু সটান উত্তর দিলেন: আমার পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হ'লো!

—তোমার জরিমানা? কেন? তুমিইতো টাকা পাবে!

অবিনাশবাবু বললেন: এই রকমই হয়ে থাকে! "যার ধন তার ধন নয়; নেপোয় মারে দই!"

গৃহিণীকে সত্য ঘটনা বলতে তাঁর সাহস হলো না, পাছে তিনিও তাঁকে 'বেকুব' ঠাওরান! 'আইন কানুন আজকাল বদলে গেছে!' 'যে মকদ্দমা করে তারই জরিমানা হয়!' ইত্যাদি নানারকম আবোল-তাবোল ব'লে ঘরের গার্জেনকে ঠাণ্ডা করলেন।

সেদিন থেকে আজও পর্যন্ত অবিনাশবাবু চিন্তা করেন, পকেট-মারার সঙ্গে উকিলের কোনও সম্বন্ধ আছে কি না!

খুড়োর বুদ্ধি

(১)

খুড়ো, খুড়ো, খুড়ো! কাণ একেবারে ভাজা উচ্ছে করে তুললে ডেকে ডেকে! কি আপদ! পাড়ার ছেলে বুড়ো, মাঝ-বয়সী আধা-বয়সী যে যেখানে আছে, সবাই ডাকে ঐ নাম দিয়ে!

ব্যাপারটা ঘটেছে এই রকম! বাঁড়ুয্যেদের কেনারামের ছিল একটা অকালকুষ্মাণ্ড ভাইপো! কেনারাম যতো তাকে শেখাতো 'কাকাবাবু' ব'লে ডাকতে, সে হতভাগা ততো তাকে 'খুড়ো খুড়ো' ব'লে ডেকে জ্বালাতন করতো! কাজেই কেনারাম একদিন রেগে-মেগে গেল তাকে মারতে। ছোঁড়া সুড়ুৎ ক'রে সরে পড়লো হাত ফসকে,—হড়-হড়ে সিঙি মাছের মত,—তার পরই দিল চোঁচা দৌড় খরগোসের মত। কেনারাম তল-ভারি লোক, তাকে পারলে না ধরতে। ব্যস্, তার পর থেকেই এক বিষম কাণ্ড!

ডেঁপো ভাইপো'টা দরকারে-অদরকারে ডাকতে আরম্ভ কর্লে 'খুড়ো খুড়ো' ব'লে! খুড়ো চ'টে লাল! বললে 'দেখবি'? কিন্তু ঐ বলাই সার! শারীরিক ভারকেন্দ্রের বিষমতার জন্যে কিছুতেই ভাইপো'টাকে ধরতে পারে না,—কাজেই শায়েস্তাও কর্ত্তে পারে না।

ওদিকে প্রতি-পক্ষ দল জোটালে ; অর্থাৎ পাড়ার সম-বয়সী ছেলে-মেয়েদের ডেকে শিখিয়ে দিলে, "এই, সকলে ডাকবি খুড়ো ব'লে।" ব্যস্! পেছনে ফেরুর পাল লাগলো! একটা ভাইপো তখন দশটা হোলো ; দশটা, দেখতে-না-দেখতে হয়ে দাঁড়ালো পঞ্চাশটা! তখন 'খুড়ো-খুড়ো' শব্দে আকাশ, বাতাস, মায় পুকুর ডোবাগুলো পর্য্যন্ত থর্ থর্ ক'রে কাঁপতে আরম্ভ করে দিলে!

খুড়ো বাড়ী থেকে বেরুলেই একজন ডাকে 'খুড়ো'! সেই দিকে চাইলেই আর একজন পেছন দিক থেকে ভ্যাঙ্চায় "খুড়ো?" সে'দিকে চাইতে গেলে, কোথা থেকে যে এক অক্ষৌহিনী সেনা শব্দভেদী বাণে খুড়োকে জর্জ্জরিত করে তোলে, তা সে কিছুতেই ঠাহর কর্ত্তে পারে না।

মোট কথা, খুড়ো যতো চ'টে যায়, খুড়োর নতুন-ভর্ত্তি ভাইপোরা তত তামাসা পায়। খুড়ো যতো ধরতে যায় ততো তারা পালায়, আর লুকানো জায়গা থেকে ইট ছোড়ে, কাঁদা ছোড়ে, গায়ে ধুলো দেয়। মহা মুস্কিল!

বালকদিগের ব্যঙ্গ-কেন্দ্র হওয়া বড় বিপজ্জনক ব্যাপার। শীঘ্রই এটা ছোঁয়াচে রোগের মত ছড়িয়ে পড়ে বড়দের কাছেও। ক্রমে পাড়ার তরুণ প্রৌঢ়রাও (অবশ্য যাঁদের মন থেকে এখনও যৌবনের রঙ্-তামাসা মেলায় নি) ঐ ব্যাপক হুজুগে যোগদান কর্লেন।

খুড়ো অস্থির হয়ে, গেল পাড়ার এক সর্দ্দার যুবকের কাছে,

এর একটা ব্যবস্থা কর্ত্তে। যুবকটির ওপর কেনারামের খানিকটা বিশ্বাস ছিল, কেন না সে কখনও তা'কে খুড়ো ব'লে এ পর্য্যন্ত ডাকে নি। যুবকটি সমস্ত কথা কেনারামের মুখে শান্ত ভাবে শুনে মুখে গম্ভীর হ'ল, কিন্তু মনে মনে হেঁসে গড়িয়ে গেল। বেশ প্রবীণ ব্যক্তির মত ঘাড় নেড়ে কেনারামকে উপদেশ দিলেঃ দেখুন, আপনি সহ্য কর্ব্বেন না। ওরা যেমনি ডাকবে 'খুড়ো' ব'লে, আপনি অমনি তাদের গালাগালি দেবেন। আপনি সত্যিত আর ওদের সঙ্গে দৌড়তে পার্ব্বেন না, কাজেই মারতেও পার্ব্বেন না। গালাগালি দেওয়া ছাড়া ছোঁড়াগুলো শায়েস্তা হবে না!"

—কি ব'লে গালাগালি দেবো? কেনারাম জিজ্ঞাসা করলো।

যুবক মুখে হাঁসি টিপে বললে,—যেই কোন ছোঁড়া খুড়ো বলবে,—অমনি তাকে বলবেন 'তোর বাবার ভাইপোর খুড়ো!' ব্যস, তাহলেই ছোড়াগুলো দেখবেন থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়ে যাবে।

—ঠিক বলেছো তুমি! এইবার থেকে তাই কর্ব্বো!

তার পরে পাড়ায় অন্যরকম হট্টগোল আরম্ভ হ'ল। পাড়ার বিজ্ঞব্যক্তিরা শোনে, একদিকে এক পল্টন ছেলে চেঁচাচ্ছে, "খুড়ো, খুড়ো!" আর অন্যদিকে বাঁড়ুয্যে কেনারাম চেঁচাচ্ছে, 'তোদের বাবার ভাইপো'র খুড়ো রে শালারা!" প্রবল চিৎকার, কোন পক্ষই বাগ্-যুদ্ধে ভগ্নোদ্যম নয়!

ডিস্‌পেনসারিতে আড্ডা দেয়। কিন্তু তাদের আড্ডাও একটু ভড়কে গেছে, বেজায় রকমের হরিবোলের শব্দে।

ডাক্তার মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করা। সে বললে: গ্রামকে গ্রাম উচ্ছন্ন যাবে, যদি না তোমরা গ্রামের পুকুরগুলো আট্‌কাও। কেউ যেন পুকুরে মল-মূত্র-ওয়ালা কাপড়-নেক্‌ড়া না কাচে,—আর কেউ যেন টিউব-ওয়েলের জল ছাড়া না খায়! পুকুরে পাহারা বসাও,—গ্রামের মহামারী একদম বন্ধ হয়ে যাবে।···সকলকে বলে দাও "পুকুরের জল খেলেই কলেরা হবে!"

তরুণেরা ডাক্তারের খুব বশ। সে যা বললে, অক্ষরে অক্ষরে তাই কর্ত্তে লাগলো। সকলে মিলে একটা সমিতি করলে! গ্রামে যত পুকুর আছে, সব গুলোতে পাহারা দেবার জন্যে সময় ভাগা-ভাগি হলো। ডিউটি বসলো; সকলেই কোমর বেঁধে নিয়ম মত পাহারা দিতে লাগলো যাতে কেউ পুকুরের জল নষ্ট না করে।

কেনারাম খুড়োর টনক নড়লো! 'এ আবার কি! কলেরা তাড়াতে গেলে কোথায় তেমাথা রাস্তায় রক্ষাকালী পূজো কর্ব্বি,—পাড়ার পাঁচজন বামুনকে খিচুড়ী বেঁধে খাওয়াবি,—তবেত মহামায়া রক্ষে-কালি সব রক্ষে কর্ব্বেন! গ্রামে কলেরা থামাবেন। তা নয়, যত সব কুচ্ছিৎ! পুকুর বন্দ করো! আরে, পুকুরের জলের ভেতর কি যম-দূতেরা লুকিয়ে থাকে?'

আবার খাড়া ভাবে: 'মরুক গে, যত বেটা খিশ্চানের দল!

যেমনি বেটারা আমার পেছনে লেগেছে,—তেমনি বেটাদের খুড়ো বলা একেবারে একসঙ্গে শেষ হয়ে যাক্!'

খুড়োর বাড়ীর পিছনে একটা পুকুর ছিল। সেটা পাড়ার আরও পাঁচজনে সরে!

পুকুরের ওপর জোর পাহারা চলেছে। তিন ঘণ্টা অন্তর ডিউটি বদল হয়। খুড়ো নিজের ঘরে বসে জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখে, আর মুখ টিপে হাঁসে।

রাত্রি এগারটার পর থেকে পাহারাটা একটু ঢিলে রকমের হয়। ব্যবস্থা ঠিকই আছে, কিন্তু অবস্থা একটু কাল ভেদে নিপাতনে-সিদ্ধ হয়। যারা পাহারা দেয় তারা সকলেই অবৈতনিক, কাজেই মাইনে-কাটার ভয় রাখে না। কর্ত্তব্যকে হুজুগের রসান দিয়ে তার কাঠিন্য নরম করে নেওয়াই স্বাভাবিক। ফলে দাঁড়ায় এই, রাত্রিকালটায় পাহারা সব সময় স্থানে থাকেনা, বিধি-ব্যবস্থাতেই থেকে যায়।

মহামারীর প্রথম ধ্বংস-বন্যাটা পাড়ার ছোকরাদের এই স্বেচ্ছা-প্রণোদিত গণস্বাস্থ্যিক ব্যবস্থায় সত্যিই অনেকটা কমে গেল বটে, কিন্তু এখনও দু'চারটে আক্রমণ সবলভাবেই চলেছে। খুড়ো একটু দুঃখিত হয়েছে, কেন না-যেসব চেংড়া ছোঁড়াগুলো তার বাইরে-বেরোন একেবারে অসম্ভব করে তুলেছিল, তাদের অনেকেই এখনও মহামারীর চোয়ালের মধ্যে প্রবেশ করে নি। খুড়ো যতোটা আশা করেছিল, বা আকাঙ্ক্ষা করেছিল, তার সিকি ভাগ এখনও পূর্ণ হয় নি ব'লে খুড়ো মনে মনে আপশোষ

করে। কাজেই পাহারা ঢিলে দেখলে খুড়ো একটু উৎসাহান্বিত হয়ে ওঠে।

পুকুরের দক্ষিণ দিকে এক ঘর বাগদী বাস করতো। এই সময়ে তাদের একজন পড়লো রোগে। চিকিৎসা চলে কতক ডাক্তারি মতে, কতক বাবা-ঠাকুরের দোরের মাটি খাইয়ে,— কতক পাঁচ পয়সার হরির লুঠের অঙ্গীকারে! মোট কথা সমস্ত বিশ্বাস-চিকিৎসাটা খুব জোর চলেছে দেবতার পূজোর বেমক্কা বাসী ফুলে। রোগ তখনও প্রাণকে নিয়ে বেশ আছাড় মারছে যমদূতের আমদানী-করা অমসৃণ পাথরের ওপর। ঠিক এমনি সময় একদিন একটা সুযোগ পেলো খুড়ো।

বাগদীদের বাড়ীর মেয়েরা রুগীর নোংরা কাপড় নেক্ড়া কাচবার জন্য খুড়োদের বাড়ীর পেছনের এই পুকুরটাকে ব্যবহার কর্ব্বার জন্যে সুযোগ খোজে। কেবল নজর রাখে, কখন্ পাহারা না থাকে। দিনের বেলায় সমিতির ছেলেরা প্রায়ই সতর্ক প্রহরা দিয়ে থাকে,—কেবল রাত্রিটায় হয় একটু গোলমাল। বাগদীদের বাড়ীর মেয়েদের সেটা নজরে পড়লো,—তারা সমস্ত দিনের নোংরা কাপড়-চোপড় জমিয়ে রেখে রাত্রিতেই লুকিয়ে কাচতে আরম্ভ করলে।

খুড়োর নজরে এটা পড়লো। খুড়ো একবার ভাবলে, পাড়ার ছোঁড়াদের ব'লে বাগদীদের এই গুপ্ত অপকার্য্যটা বন্ধ করে দেয়; কিন্তু হঠাৎ মাথায় সয়তান চাপলো। একটা

'কে নাবছেরে পুকুরে ?' রাত বারোটায় খুড়ো হাঁকে।

কেউ উত্তর দেয় না। একটা কালো ছায়া রাত্রির অন্ধকারে গাছের আড়ালে মিশিয়ে যায়। তবু খুড়ো বেশ বুঝতে পারলে, বাগ্‌দীদের বউ এসেছে রুগীর নোংরাগুলো কাচতে। সে অনুচ্চস্বরে বললে :

—"আচ্ছা, আচ্ছা, কাচ্, কাচ্। কে, বাগ্‌দী বউ ? কাচ কাপড়, তবে দেখিস্ পুকুরের জলে যেন নোংরা ভেসে না থাকে!"

তাঁহার পরেই খুড়ো আড়াল থেকে দেখে, ঐ কালো ছায়াটা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো এদিক্ ওদিক্ চাইতে চাইতে। ধীরে ধীরে নামলো পুকুরের জলে। তার পর, খুড়ো বেশ শুনতে পেলো, সপ্ সপ্ ঝপাঝপ্ শব্দ। কলেরা রোগীর নোংরা ন্যাকড়াগুলো যে পুকুরের জলে কাচা হচ্ছে, তাতে আর সন্দেহ রইলো না। এর ফল কি হবে ? খুড়ো একবার ভেবে নেয়। খুড়ো দিব্য চক্ষে দেখতে পেলো, এর ফলে পুকুরের জল হয়েছে বিষাক্ত, আর সেই জল খেয়ে, পাড়ার যে-ছেলেগুলো তাকে খুড়ো 'খুড়ো' ব'লে ক্ষেপায়, ঠিক সেই ছেলেগুলোরই হয়েছে ভয়ানক ভেদ-বমি। আর সেই রোগেতেই ছোঁড়াগুলো একেবারে চালান হয় এমন জায়গায়, যেখান থেকে বাছাধনদের আর ফিরতে হবে না তাকে 'খুড়ো' 'খুড়ো' ব'লে জ্বালাতন করতে! ওঃ! সেটা কি সুখেরই দিন হবে, যেদিন খুড়ো রাস্তা দিয়ে যাবে, অথচ পেছনে কি

সুমুখে এমন-কোন এঁচোড়ে-পাকা ছেলে থাকবেনা, যে তাকে ঢিল ছুঁড়ে কি হাততালি দিয়ে অপমান কর্ব্বে!' খুড়ো এই সুখ-স্বপ্নের ছবি মনের চোখে বেশ স্পষ্টভাবেই দেখতে পেলো।

দু'দিন কাটলো। খুড়ো কেবলই আশা কচ্ছে, শুনবে পাড়ার দু'তিনটে ছেলের একসঙ্গে কলেরা হয়েছে। কিন্তু কেন যে সে সংবাদ নিত্য এসে তার কাছে পঁছছিতেছিল না, তার কারণ খুড়ো কিছুতেই অনুমান করতে পারে না।

কিন্তু আজ সকালে একি খবর? তারই একমাত্র ছেলে, রমেন, কাল রাত্রি থেকে ভেদ-বমি আরম্ভ করেছে! সর্ব্বনাশ! খুড়ো ত মাথায় হাত দিয়ে বসলো! অপমানের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে একি উল্টো বিপ্লব?

খুড়ো প্রথমে বিশ্বাস করলে না যে তার ছেলের এত বড়ো রোগ হতে পারে। কিন্তু যখন ডাক্তার এসে ইন্‌জেক্‌শন দিতে লাগলো, এবং—ঘণ্টা তিন চার পরে অতি অবিশ্বাস্যভাবে ছেলে তার জীবনের ঋণ শোধ করে পালালো,—তখন খুড়ো সত্যই পাগল হয়ে উঠলো।

কলেরা হবে পাড়ার লোকের—বিশেষ যে-সব চ্যাংড়াগুলো তাকে 'খুড়ো খুড়ো' ব'লে ফেউয়ের মতো শিয়াল-তাড়া তাদের! কলেরা যে তার নিজের ছেলেরও হতে পারে,— নিয়তির এ বিশ্বাস-ঘাতক তামাসার কথা খুড়োর মাথা আসে নি। তাই সেটা সত্য-সত্যই ঘটতে খুড়ো একেবারে

পুত্র-শোক সব পিতারই বুক ভেঙ্গে দেয়। তবে যাঁরা নানা শাস্ত্র পড়ে, জীবনের 'পদ্মপত্র-নীর'বৎ অবস্থার কথা হৃদয়ঙ্গম করেছেন,—তাঁরা হয়তো শোকটা মনের মধ্যে চেপে রেখে ধৈর্য্যের কোলে কোনও রকমে সান্ত্বনা খুঁজে পান! কিন্তু যারা সামান্য কারণেই চঞ্চল হয়ে ওঠে,—তারা পুত্র-শোকের মত বিষম ঝড়ে একেবারেই মুষড়ে পড়ে! মনের উচ্ছ্বাস তারা কিছুতেই চেপে রাখতে পারে না।

খুড়ো পুত্র-শোকে এমন উন্মাদ হয়ে উঠলো যে, রাস্তায় ভেউ-ভেউ ক'রে কাঁদতে কাঁদতে ছোটা ছুটি করতে লাগলো। পাড়ার লোক তার প্রতি খুব সদয় না থাকলেও আজ তার প্রতি সহানুভূতি অনুভব করতে লাগলো। আজ আর কোনও বালক 'খুড়ো খুড়ো' ব'লে তার পেছন পেছন তাড়া করলে না, কিন্তু তাকে পরিহার করতে লাগলো। লোকেরা খুড়োকে আজ এড়িয়ে চলতে লাগলো।

রোগ পিতা-পুত্রের বাদ-বিচার করে না। তার কাছে বয়সের সম্মান নাই, পদবীর খাতির নাই। রাজা আর প্রজা দু'জনেই রোগের কাছে এক খাঁচায় পোরা পাখী।

যখন যে-বাড়ীতে কলেরা-রোগ একবার প্রবেশ করে, তখন দু'এক দিনের মধ্যেই এক বাড়ীরই অনেক লোক পর-পর আক্রান্ত হয়। যেদিন সকালে খুড়োমশাই তাঁর পুত্রটিকে হারালে,—সেদিন রাত্রে রোগ তাকেই আবার বেছে নিল।

সমস্ত রাত খুড়ো বমি করলো আর শরীরের রক্তে রোগের

ক্ষুধা মিটাতে লাগলো। রাত্রে কোনও পল্লীবাসী খবর নিলোনা তার, পুত্র-শোকে উন্মত্ততা বেড়েছে ব'লে। স্ত্রী পর্য্যন্ত অমনি একটা অজুহাত নিয়ে, ভুলে হোক, অভুলে হোক,—পাড়ার কারুকে খবর দিল না। সমস্ত রাত রোগ খুড়োকে টানা-হিঁচড়া করতে লাগলো,—কোন ডাক্তার এসে রোগের সঙ্গে লড়াই আরম্ভ করলো না।

ফলে যা ঘটবার, তাই ঘটলো। বেলা বারোটার সময়ে পাড়ার এক প্রতিবাসীর নিকট খবর পেয়ে ডাক্তার-বাবু যখন তার বাড়ীতে এলেন,—তখন বেচারা খুড়ো সকল ভাইপোর অত্যাচার থেকে আপনাকে মুক্ত করেছে।

পরের অনিষ্ট কর্ব্বার চেষ্টার মধ্যে নিজের অনিষ্টের গোপন মূল চিরদিনই অন্তর্নিহিত থাকে। ওটা শাঁখের করাত!